চন্দ্রশেখর-তত্ত্ব

(বঙ্কিমচন্দ্রের "চন্দ্রশেখরে"র আলোচনা)

দৌলতপুর হিন্দু একাডেমির বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক
শ্রীরাধারমণ চক্রবর্ত্তী, এম্-এ
ও
ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজের বাংলা ও সংস্কৃতের অধ্যাপক
শ্রীসত্যকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়, এম্-এ
প্রণীত

মূল্য দশ আনা

শ্রীরাধারমণ চক্রবর্ত্তী, এম,-এ, কর্ত্তৃক
বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া) হইতে প্রকাশিত।

সোল্ এজেণ্টস্
কমলা বুক ডিপো লিমিটেড্
১৫ নং কলেজ স্কোয়ার,
কলিকাতা।

৬৬-১ এ, বৈঠকখানা রোড,
মডেল লিথো এণ্ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে
শ্রীশশীভূষণ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।

উৎসর্গ

বঙ্কিম সাহিত্যের

সুবিজ্ঞ সমালোচক রসগ্রাহী পণ্ডিত

৺ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাশয়ের পুণ্য স্মৃতিতে

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি লেখকদ্বয়ের আন্তরিক

শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ

উৎসৃষ্ট হইল।

ভূমিকা

এই ক্ষুদ্র সমালোচনা পুস্তিকাখানি প্রণয়নে আমরা বঙ্কিমসাহিত্যের সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক স্বর্গত অধ্যাপক ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পন্থা অনুসরণ করিয়াছি। এ বিষয়ে কতদূর সাফল্য লাভ করিয়াছি তাহার বিচার ভার সহৃদয় সুধীগণের উপর প্রদান করিলাম।

এই গ্রন্থ রচনায় দৌলতপুর হিন্দু একাডেমির ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র মজুমদার এম্ এ, আমাদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

বৈশাখ পূর্ণিমা, ১৩৩৯ — গ্রন্থকারদ্বয়

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(১৮৩৮—১৮৯৪)

চব্বিশ পরগণা জেলায়, বারাসত মহকুমার অন্তর্গত কাঁঠালপাড়া গ্রাম। সেই গ্রামের সম্ভ্রান্ত চট্টোপাধ্যায় বংশে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জুন বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম হয়। কাঁটালপাড়ার পশ্চিমে গঙ্গা, উত্তরে নৈহাটী, দক্ষিণে ভাটপাড়া, পূর্ব্বে দেলপাড়া। গঙ্গার এক পারে কাঁটালপাড়া অপর পারে চুঁচুড়া। বঙ্কিমচন্দ্রের পিতার নাম যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি প্রথমে নিমকির দারোগা ছিলেন। পরে ডেপুটি কালেক্টর পদে উন্নীত হইয়াছিলেন।

গ্রাম্য পাঠশালায় কয়েক মাস অধ্যয়ন করিবার পর বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৪৪ অব্দে মেদিনীপুরে পিতার নিকট আসিয়া ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি হন। গুরু-মহাশয়ের পাঠশালায় অধ্যয়ন কালে তাঁহার অদ্ভুত বুদ্ধিমত্তা ও স্মৃতি-শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। পিতার নিকট কিছুকাল থাকিয়া তিনি ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে বাড়ীতে আসেন এবং সেখানে থাকিয়া হুগলী কলেজে বিদ্যাভ্যাস করিতে থাকেন।

তিনি দশ এগার বৎসর হুগলী কলেজে কঠোর পরিশ্রমের সহিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার অধ্যয়ন-স্পৃহা অত্যন্ত বলবতী ছিল। তাঁহার স্বভাবের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য সর্ব্বদা লক্ষিত হইত। কি বাল্যে,

কি কৈশোরে, কি যৌবনে, কি প্রৌঢ়াবস্থায় তাঁহার সেই চাঞ্চল্য একেবারে তিরোহিত হয় নাই। ইহা যেন প্রতিভার চাঞ্চল্য। অন্তরের মহাশক্তি যেন তাঁহাকে স্থির থাকিতে দিত না। এই মানসিক চাঞ্চল্য প্রায়ই বাহিরে প্রকাশ পাইত। তিনি পাঠে তন্ময় হইয়া বেশীক্ষণ একাসনে বসিয়া থাকিতে পারিতেন না। কিন্তু তাহার অপূর্ব্ব ধীশক্তির ফলে এ চাঞ্চল্য তাঁহার অপকার না করিয়া উপকারই করিয়াছিল।

জ্ঞানতৃষ্ণা একপ্রকার মানসিক চাঞ্চল্য। বঙ্কিমচন্দ্রের এই তৃষ্ণা এরূপ বলবতী ছিল যে, তিনি কিছুতেই নিজের পাঠ্য পুস্তকে মন আবদ্ধ রাখিতে সমর্থ হইতেন না। বিবিধ বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। হুগলী কলেজের সুবৃহৎ লাইব্রেরী হইতে তিনি ইতিহাস, জীবনী, সাহিত্য, কাব্য, দর্শন ইত্যাদি নানাবিষয়ক পুস্তক পাঠ করিতে লাগিলেন। পরীক্ষার অব্যবহিত পূর্ব্বে মাত্র নিজের পাঠ্যে মনোনিবেশ করিতেন, কিন্তু তিনি এমনই মেধাবী ছিলেন যে অল্প সময় পাঠ করিয়াও স্বশ্রেণীতে শীর্ষস্থান অধিকার করিতেন। তিনি কৈশোরে বলিতেন "আমি পুস্তক পাঠে যত আনন্দ পাই, তত আনন্দ আর কিছুতেই পাই না।"

লিখন-পঠন ছাড়া তিনি আর একটি বিষয়ে আনন্দ পাইতেন। প্রকৃতির বিচিত্র শোভা চিরদিন কবি-মনের উপর অপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রও সৌন্দর্য্যের একজন প্রধান উপাসক ছিলেন। তিনি নিজ বাটীর নিকট 'অর্জ্জুনা' নামক দীঘির পাড়ে একটি সুন্দর উদ্যান রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত "কৃষ্ণকান্তের উইল্"এ এই 'অর্জ্জুনা' দীঘিই "বারুণী" নামে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তিনি প্রথম বয়সে কিঞ্চিৎ কৃশকায় ছিলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার সাহস

ছিল অসীম। শচীশচন্দ্র বলেন, অদৃষ্টের উপর নির্ভরতাই ছিল এই সাহসের মূল উৎস।

ছাত্রাবস্থাতেই বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক জীবনের সূত্রপাত হয়। তিনি যখন হুগলী কলেজে পড়েন, তখন বঙ্গের অপর দুইটি প্রতিভাশালী যুবক অন্যত্র শিক্ষালাভ করিতেছিলেন। একজন সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র এবং অপরজন দ্বারকানাথ অধিকারী। দীনবন্ধু কলিকাতার বিখ্যাত হিন্দু কলেজে পড়িতেন এবং দ্বারকানাথ পড়িতেন কৃষ্ণনগর কলেজে। ইঁহারা উভয়েই বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। সাহিত্যের মধ্য দিয়া এই তিনজন মেধাবী যুবকের পরিচয় ঘটে দ্বারকানাথ বঙ্কিমচন্দ্রের নাম দিয়াছিলেন 'চট্ট কবি'।

বঙ্কিমচন্দ্রের পাঠ্যাবস্থায় বাঙ্গালা সাহিত্যের অবস্থা বড় শোচনীয় ছিল। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তখনকার অপ্রতিদ্বন্দ্বী সাহিত্য-সম্রাট্ ছিলেন। তিনি "সম্বাদ-প্রভাকর" ও "সাধুরঞ্জন" নামক দুইখানি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এই পত্রিকাদ্বয়ের মধ্যে প্রথমখানি ছিল দৈনিক এবং দ্বিতীয়খানি সাপ্তাহিক। উভয় পত্রিকায় নানাবিধ সংবাদের সঙ্গে কবিতাদিও প্রকাশিত হইত। গুপ্তকবির কবিতায় অনুপ্রাস, যমকাদির প্রাচুর্য্য লক্ষিত হয়। তাঁহার কাব্য-শিষ্যেরাও তাঁহারই অনুকরণ করিয়া নানাবিধ কবিতাদি লিখিয়া পাঠাইতেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স হইতে (ইংরাজী ১৮৫২ সাল) কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। তিনি কখনও নিজ নামে, কখনও শ্রী ব, চ, চ, অথবা শ্রীঅষ্টমাবতার চট্টোপাধ্যায় আবার কখনও বা শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় নামে "সংবাদ প্রভাকরে" লিখিতেন। সম্পাদকীয় মন্তব্যে গুপ্তকবি মধ্যে মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার উল্লেখ করিয়া প্রশংসা করিতেন

এবং আবশ্যকমত উপদেশাদিও দিতেন। কবিতা ছাড়া 'সংবাদ প্রভাকরে' বঙ্কিমের গদ্য-রচনাও প্রকাশিত হইত।

তখনকার দিনে বাঙ্গালা দেশে কবি, তরজা, পাঁচালী ইত্যাদির বহুল প্রচলন ছিল। রাম বসু, ভোলা ময়রা, হরু ঠাকুর ইত্যাদি কবিগণের মধ্যে প্রায়ই প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিত। এই সমস্ত কবিদিগের প্রভাব তৎকালীন নবীন সাহিত্যিকগণও অতিক্রম করিতে পারেন নাই। কিছু দিন ধরিয়া গুপ্ত কবির "সংবাদ প্রভাকরে"র মারফৎ দীনবন্ধু, দ্বারকানাথ ও বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতা যুদ্ধ চলিয়াছিল। এই যুদ্ধের নাম হইয়াছিল "কালেজীয় কবিতা-যুদ্ধ"। দেশের গুণগ্রাহী ব্যক্তিগণ ছাত্রগণের এই কবিতা-যুদ্ধে প্রীতিলাভ করিতেন এবং তাঁহা দগকে উৎসাহিত করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করিতেন। গুপ্তকবি বঙ্কিমচন্দ্রের এই সময়ের রচনার উপর এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন :—

"বঙ্কিমচন্দ্রের বিরচিত কবিতার সুবঙ্কিম ভাব কৌশল সকল অতিশয় সন্তোষজনক, ইনি রূপক বর্ণনাস্থলে নায়ক নায়িকার কথোপকথন ছলে যে সমস্ত প্রগাঢ় ভাব ব্যক্ত করেন তদ্দৃষ্টে সুপণ্ডিত ভাবুক মাত্রেই প্রীত হইয়া থাকেন। ইনি অতি তরুণ বয়সে অতি প্রবীণ সুরসিক জনের ন্যায় মন হইতে অতি আশ্চর্য্য নূতন নূতন ভাব সকল উদ্ভূত করিতেছেন। এ অংশে ইঁহার প্রশংসা বর্ণনে বর্ণাবলী বলহীনা, ফলে এই স্থলে একটি অনুরোধ এই যে, বঙ্কিম পদরচনায় আর সমুদয় বঙ্কিম করুন, তাহা যশের জন্যই হইবে, কিন্তু ভাবগুলীন্ প্রকাশার্থ যেন বঙ্কিম ভাষা ব্যবহার না করেন, যত ললিত শব্দে পদবিন্যাস করিতে পারিবেন ততই উত্তম হইবেক।"

অতঃপর বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে "ললিতা ও মানস" নামক দুইটি কাবতা একত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। ইহাই তাঁহার প্রথম পুস্তক। গুপ্তকবি এই পুস্তকখানির সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন :—

"হুগলী কালেজের সুপাত্র ছাত্র শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঙ্গভাষার যেরূপ

সুলেখক ও সুকবি তাহা প্রভাকর পাঠক মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকেই বিশিষ্টরূপ জ্ঞাত আছেন. ....সম্প্রতি ঐ বঙ্কিমবাবু "ললিতা ও মানস" নামে একখানি পুস্তক রচনা পূর্ব্বক মুদ্রাঙ্কণ করিয়া আমাদিগের নিকট পাঠাইয়াছেন। আমরা তাহা পাঠ করিয়া পরম পুলকিত হইলাম, যেহেতু এই ক্ষুদ্র পুস্তকে বিলক্ষণ কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য প্রকাশ হইয়াছে, লেখক মহাশয় স্থানে স্থানে যে সমস্ত সদ্ভাব বর্ণনা করিয়াছেন তাহাও উত্তম হইয়াছে...ইত্যাদি"।

বাল্যজীবনে বঙ্কিমচন্দ্র গুপ্তকবির পত্রিকার সাহায্যে সাধারণের নিকট সুপরিচিত হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি দীনবন্ধুর ন্যায় গুপ্ত-কবিকে গুরুরূপে গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার বাল্যরচনায় গুপ্তকবির প্রভাব কিঞ্চিৎ পরিমাণে দৃষ্ট হইলেও পরবর্ত্তী কালে তাহা সম্পূর্ণ ভাবে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। বঙ্কিম-জীবনী প্রণেতা শচীশচন্দ্র বলেন, "আমি শুনিয়াছি কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্রকে একদিন বলিয়াছিলেন, 'তোমার লিখিবার শক্তি যথেষ্ট আছে, কিন্তু তুমি পদ্য না লিখিয়া গদ্য লিখিবে।' "

বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের এই উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়াছিলেন। গুপ্তকবির পন্থা অনুসরণ না করিলেও তিনি তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন। সেই শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ তিনি "কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনী" লিখিয়া গিয়াছেন।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে হুগলী কলেজের পাঠ সমাপন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র কলিকাতায় উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য গমন করেন। তিনি হুগলী কলেজ হইতে Senior Scholarship পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া একটি বৃত্তি পাইয়াছিলেন। তখন সিপাহী বিদ্রোহের আমল। কলিকাতার অবস্থা তখন অতি ভয়ানক। সেই চাঞ্চল্যের মধ্যেও

বঙ্কিমচন্দ্র নিবিষ্টচিত্তে আইন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহাবসানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বি, এ পরীক্ষার প্রবর্ত্তন করা হয়। বঙ্কিমচন্দ্র আইন ছাড়িয়া বি, এ পরীক্ষার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন। তখন পরীক্ষার দুইমাস মাত্র বিলম্ব। পরীক্ষায় ১৩ জন ছাত্র উপস্থিত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে মাত্র দুইজন দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইলেন। প্রথম হইলেন বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিতীয় হইলেন বাবু যদুনাথ বসু।

পরীক্ষার ফল প্রকাশ হইবার পর বাঙ্গালার তদানীন্তন ছোটলাট হ্যালিডে সাহেব বঙ্কিমচন্দ্রকে ডাকিয়া আনিয়া ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজ গ্রহণ করিতে বলেন। উক্ত চাকরী গ্রহণ করিতে তাঁহার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না; পরন্তু পিতার আদেশে তাঁহাকে ঐ পদ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম কর্ম্মস্থল যশোহর। এইখানেই দীনবন্ধু মিত্রের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে। এই দুই সাহিত্যিক বন্ধুর সৌহার্দ্দ আজীবন স্থায়ী হইয়াছিল. ইং ১৮৫৮ সালের মাঝামাঝি তিনি কর্ম্মে প্রথম নিযুক্ত হন। যশোহরে দেড় বৎসর কাটাইয়া তিনি মেদিনীপুর জেলায় কাঁথির সন্নিকটবর্ত্তী নাগোয়া নামক স্থানে বদলী হন। সেখানে কয়েক মাস কার্য্য করিয়া তিনি খুলনাতে বদলি হন। খুলনা তখন যশোহরের একটি মহকুমা ছিল।

খুলনায় অবস্থান কালে তিনি তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশ-নন্দিনী' লিখিতে আরম্ভ করেন। এই উপন্যাসখানি ইং ১৮৬৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। পর বৎসর অর্থাৎ ইং ১৮৬৬ সালে তাঁহার "কপালকুণ্ডলা" প্রকাশিত হইল। এই উপন্যাসখানি প্রকাশের পর তাঁহার যশঃ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। ইং ১৮৬৮ সালে তিনি কিছু দিন ছুটি লইয়াছিলেন।

ঐ সময়ে "মৃণালিনীর" পাণ্ডুলিপি ছাপিতে দিয়া তিনি কাশী যান। পর বৎসর তিনি 'মৃণালিনী' প্রকাশ করিয়া এবং B L. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বহরমপুরে কার্য্যে যোগ দেন।

১২৭৯ সালের বৈশাখ মাসে (এপ্রিল, ১৮৭৩) বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় "বঙ্গদর্শনের" প্রথম আবির্ভাব হয়। ইহা তদানীন্তন বাঙ্গালার একখানি উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রিকা বলিয়া শিক্ষিত জনসাধারণের নিকট বিশেষরূপে আদৃত হইয়াছিল। ইহাতে দীনবন্ধু মিত্র, কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, অক্ষয়চন্দ্র সরকার ইত্যাদি খ্যাতনামা সাহিত্যিকগণ প্রবন্ধাদি লিখিতেন। এই পত্রিকাতেই বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলি একে একে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল শচীশ বাবু নিম্নলিখিত তালিকাটি "বঙ্কিম-জীবনীতে" সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন ঃ—

(১) বিষবৃক্ষ	বৈশাখ, ১২৭৯—চৈত্র, ১২৭৯
(২) ইন্দিরা	চৈত্র, ১২৭৯
(৩ যুগলাঙ্গুরীয়	বৈশাখ, ১২৮০
(৪) চন্দ্রশেখর	আশ্বিন, ১২৮০—ভাদ্র, ১২৮১
(৫) কমলাকান্ত	ভাদ্র, ১২৮০—বৈশাখ, ১২৮২
(৬) রজনী	আশ্বিন, ১৲৮১—অগ্রহায়ণ, ১২৮২
(৭) রাধারাণী	কার্ত্তিক, ১২৮২—অগ্রহায়ণ, ১২৮২
(৮) কৃষ্ণকান্তের উইল	পৌষ, ১২৮২—মাঘ, ১২৮৪
(৯) কমলাকান্তের পত্র	পৌষ ও ফাল্গুন, ১২৮৪ ও শ্রাবণ, ১২৮৫
(১০) রাজসিংহ	চৈত্র, ১২৮৪ তে আরম্ভ হয়।

বঙ্গদর্শনে গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয় নাই

(১১) মুচিরাম গুড়ের জীবন-চরিত আশ্বিন, ১২৮৮
(১২) আনন্দমঠ চৈত্র, ১২৮৭—১২৮৮
(১৩) দেবী চৌধুরাণী পৌষ, ১২৮৯—মাঘ ১২৯০
পর্য্যন্ত চলে; বঙ্গদর্শনে সম্পূর্ণ হয় নাই।

শিক্ষিত সাধারণের অনাদৃতা বঙ্গভাষা বঙ্গদর্শনের আবির্ভাবে দিন দিন সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতে লাগিল। বঙ্কিমচন্দ্রের সর্ব্বতোমুখিনী প্রতিভা সাধারণের চক্ষুর সম্মুখে এক নূতন জগতের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিল। বঙ্গভাষার যে এত শক্তি আছে, তাহা শিক্ষিত সাধারণ কখনও কল্পনাও করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র একাধারে সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক, দার্শনিক, সমাজ-তত্ত্বজ্ঞ ও বিজ্ঞ সমালোচক ছিলেন। তাঁহার নানাবিষয়িণী রচনা পাঠ করিয়া সাধারণের জ্ঞানপিপাসা উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিতে লাগিল। 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ হইবামাত্র তাহার জন্য কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইত। তৎকালীন ইংরাজী-শিক্ষিতগণের জনৈক মুখপাত্র রমেশচন্দ্র দত্ত বঙ্কিম চন্দ্রের "কপাল-কুণ্ডলা" ও বঙ্গদর্শন পাঠ করিয়া অতিশয় চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "বাঙ্গালাভাষা এত সুন্দর হইতে পারে, তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না।" বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াই রমেশবাবু বাঙ্গলা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম হইয়াছিল একটা যুগ-সন্ধিতে। একদিকে রক্ষণশীল সংস্কৃত পণ্ডিতের দল পাশ্চাত্য সভ্যতাকে উপেক্ষা করিয়া গৌরব অনুভব করিতেছিলেন এবং অপর দিকে ইংরাজিশিক্ষিত নব্যের দল পাশ্চাত্যের ভাস্বর দীপ্তিতে বিভ্রান্ত ও আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র উত্তমরূপে সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া প্রাচ্যের দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের মূল তত্ত্বটি অধিকার করিয়াছিলেন। অপরদিকে পাশ্চাত্যের

দর্শন বিজ্ঞানেও তিনি প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাহার উপর ছিল তাঁহার অপূর্ব্ব সর্ব্বতোমুখিনী প্রতিভা। এই তিনের সমন্বয় হইয়াছিল বলিয়া তিনি পূর্ব্ব-পশ্চিমের মিলন যজ্ঞের যোগ্য ঋত্বিক্ হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মধুসূদন যে যুগের সূচনা করিয়া গিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাহার পূর্ণবিকাশ সাধন করিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "পূর্ব্ব-পশ্চিম" নামক প্রবন্ধে বলিয়াছেন ঃ—

"বঙ্কিম যাহা রচনা করিয়াছেন, কেবল তাহার জন্যই যে তিনি বড়ো তাহা নহে, তিনিই বাংলা সাহিত্যে পূর্ব্ব পশ্চিমের আদান-প্রদানের রাজপথকে প্রতিভাবলে ভাল করিয়া মিলাইয়া দিতে পারিয়াছেন। এই মিলনতত্ত্ব বাংলা সাহিত্যের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইহার সৃষ্টিশক্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে!"

উপন্যাস ও গল্প ছাড়া নানাবিধ বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক ও ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধ দ্বারা তিনি বঙ্গদর্শনের কলেবর অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন. তাঁহার "লোক-রহস্য" "বিজ্ঞান-রহস্য" "কৃষ্ণ-চরিত্র" ও "ধর্ম্মতত্ত্ব" এখনও সাদরে পঠিত হয়। ধর্ম্মতত্ত্বমূলক "সীতারাম" তাঁহার শেষ উপন্যাস।

জীবিতাবস্থাতেই তাঁহার কয়েকখানি উপন্যাস ইংরাজিতে অনূদিত হইয়াছিল; তাঁহার উপন্যাসগুলি এতদূর আদৃত হইয়াছিল যে, কোন কোন পুস্তকের ১১শ সংস্করণ পর্য্যন্ত তিনি দেখিয়া গিয়াছেন।

তিনি তাঁহার গ্রন্থগুলিকে প্রায় প্রত্যেক সংস্করণে কিছু না কিছু পরিবর্ত্তিত করিতেন। আলোচ্য গ্রন্থেও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল। পরিশিষ্টে সে বিষয়ের উল্লেখ করা যাইবে।

কঠোর দায়িত্বপূর্ণ রাজকার্য্যে ৩৩ বৎসর ব্যাপৃত থাকিয়া তিনি ইং ১৮৯১ সালে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার যাহা কিছু

সাহিত্য সৃষ্টি তাহা রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবার কালেই সাধিত হইয়াছিল। অবসর গ্রহণ করিবার পর জীবনের সায়াহ্নে ইচ্ছা থাকিলেও অধিক কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। অত্যধিক পরিশ্রমে তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং তিনি বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হন। ইংরাজী ১৮৯৪ সালের শীতকালে ঐ রোগ বাড়িয়া উঠে এবং ঐ সালে এপ্রিল মাসে (বাঃ ২৬শে চৈত্র, ১৩০০) কলিকাতা নগরীতে তিনি ইহলীলা সমাপন করিয়া দিব্যধামে প্রস্থান করেন।

তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণ করিয়া কলিকাতা মহানগরীর জনসাধারণ শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং মৃতদেহের অনুগমন করিয়া তাঁহার প্রতি তাঁহাদের হৃদয়ের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গালী কোন সাহিত্যিকের প্রতি এরূপ শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন নাই।

ইং ১৮৯২ সালে বঙ্কিমচন্দ্রকে গবর্ণমেণ্ট "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। এ উপাধি তাঁহার যোগ্য হয় নাই। পরে ইং ১৮৯৪ সালে তাঁহাকে অধিকতর সম্মানজনক "সি, আই, ই" উপাধি দেওয়া হয়। কিন্তু যখন উপাধি বিতরণার্থ দরবার হইল তখন বঙ্কিমচন্দ্র মৃত্যুশয্যায় শায়িত।

তিনি বঙ্গবাসিগণের হৃদয়ে যে রত্ন-সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন, তাহার তুলনায় যে কোন রাজসম্মান অতীব তুচ্ছ। সুতরাং তাঁহার ভাগ্যে উপযুক্ত রাজ-সম্মান ঘটে নাই বলিয়া আমাদের দুঃখ করিবার কিছুই নাই।

চন্দ্রশেখর-তত্ত্ব

উপন্যাসের নামের সার্থকতা ও রচনাকাল

অনেক সময় উপন্যাসের প্রধান চরিত্রের নামানুসারে উপন্যাসের নামকরণ হইয়া থাকে। বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য উপন্যাসগুলির মধ্যে "মৃণালিনী" "রাজসিংহ" "কপালকুণ্ডলা" 'ইন্দিরা" "রজনী" ইত্যাদির এবং প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে তাঁহার প্রথম উপন্যাস "দুর্গেশনন্দিনী"র নামকরণও এইরূপেই হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস "গোরা" ও শরৎচন্দ্রের অন্যতম সর্ব্বাঙ্গসুন্দর উপন্যাস "দেবদাস"এর নামকরণও এইভাবেই হইয়াছে। "চন্দ্রশেখর" উপন্যাসখানির প্রধান চরিত্র চন্দ্রশেখর কিনা এ বিষয়ে সংশয় জন্মে। ইহাতে চন্দ্রশেখর অপেক্ষা "শৈবলিনী" চরিত্রেরই প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। শৈবলিনীর প্রেমকে অবলম্বন করিয়াই গ্রন্থকার একটি নিগূঢ় সামাজিক প্রশ্নের মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছেন। এই চরিত্রটি যে-সমস্ত জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে তাহাই আমাদিগকে ভাবাইয়া তুলে; সুতরাং উপন্যাস খানির নাম "চন্দ্রশেখর" না হইয়া 'শৈবলিনী" হইলেই সঙ্গত হইত, এইরূপ আমাদের মনে হয়। বোধ হয় "পাপীয়সী" শৈবলিনীর নামে উপন্যাসখানির নামকরণ করিলে ইহাতে কলঙ্ক স্পর্শ করিবে, এই ভয়ে সুরুচির মর্য্যাদা রক্ষায় যত্নশীল বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রশেখরের পবিত্র নামে ইহার নামকরণ করিয়াছেন। "যুগলাঙ্গুরীয়" ও "রাধারাণী"কে গল্প বলিয়া ধরিলে এইখানি বঙ্কিমচন্দ্রের ষষ্ঠ উপন্যাস। ইহার পূর্ব্বে দুর্গেশনন্দিনী,

কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, বিষবৃক্ষ ও ইন্দিরা প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা ১৮৭৪—৭৫ অব্দে (বাঃ ১২৮০—৮১ সালে) বঙ্গদর্শনে এক বৎসর ধরিয়া ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়।

প্রধান চরিত্রের নাম

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান চরিত্রের নামগুলির মধ্যে বেশ একটু বিশেষত্ব দেখা যায়। অনেক সময় নামগুলি চরিত্রের আভাস দেয়; সুতরাং সেগুলি সার্থক। "চন্দ্রশেখর" দেবাদিদেব মহাদেবের একটি নাম। এই উপন্যাসের নায়ক মহাদেবের ন্যায় আত্মভোলা, জ্ঞানান্বেষী, উদার-হৃদয়, সংযমী মহাপুরুষ। সুতরাং চন্দ্রশেখর নামটি তাঁহার যোগ্যই হইয়াছে। "শৈবলিনী" অর্থে নদী। নদীর উচ্ছল উদ্দামতা ও আবিলতা নায়িকা শৈবলিনীর চরিত্রে বিদ্যমান। সুতরাং নামটি নিরর্থক নহে প্রতিনায়ক "প্রতাপ" কেবল বাহুবলে নয় চরিত্রবলেও অদ্বিতীয় যাঁহার ইন্দ্রিয়জয়ের নিকট ব্রহ্মাণ্ডজয়ের গৌরবও ম্লান বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাঁহার নাম "প্রতাপ" ভিন্ন আর কি হইতে পারে? "দলনী" নামটিতে আমরা দলনীর অপূর্ব্ব সতীত্বের আভাস পাই। "যুবতীর নাম বোধ হয়, দৌলত উন্নিসা, নবাব তাহাকে সংক্ষেপার্থ 'দলনী' বলিতেন"—আমরা বলি সতীত্বের তেজে এই যুবতী পৃথিবীর সমস্ত বিপদকে দলিত করিয়া দিব্যধামে গমন করিয়াছিলেন বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার নামকরণ করিয়াছেন "দলনী"।

আখ্যায়িকার খণ্ডবিভাগ

আখ্যায়িকাটি উপক্রমণিকা ছাড়া ছয়টি খণ্ডে বিভক্ত। উপক্রমণিকায় প্রতাপ ও শৈবলিনীর বাল্যপ্রণয় দুইটি পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে।

উপক্রমণিকা এই কুমার-কুমারী—"ষোল বৎসরের নায়ক; আট বৎসরের নায়িকা"—বাল্যখেলায় কিছুদিন কাটাইল। শৈবলিনী জানিত প্রতাপের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইবে। কিন্তু প্রতাপ জানিত বিবাহ হইবে না, কারণ শৈবলিনী তাহার জ্ঞাতি-কন্যা। শৈবলিনী এইরূপ ভুল বুঝিয়া প্রতাপকে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিল। যখন কিছু বয়স বাড়িল তখন বুঝিল যে "প্রতাপ ভিন্ন পৃথিবীতে সুখ নাই।" কিন্তু এজন্মে প্রতাপকে পাইবার সম্ভাবনা নাই। গোপনে গোপনে দুইজনে পরামর্শ করিয়া গঙ্গাস্নানে গেল। গঙ্গাবক্ষে সাঁতার দিতে দিতে দুইজনে অনেক দূর অগ্রসর হইল। প্রতাপ সাঁতার দিতে দিতে বলিল, "শৈবলিনী এই আমাদের বিয়ে"। উভয়ে গঙ্গায় ডুবিয়া মরিতে আসিয়াছিল। শৈবলিনী বলিল "আর কেন, এইখানেই।" প্রতাপ ডুবিল। শৈবলিনী ডুবিল না। প্রাণের ভয় হইল। মনে ভাবিল—"কেন মরিব? প্রতাপ আমার কে?" সে সন্তরণ করিয়া কূলে ফিরিয়া আসিল। এই অধ্যায়েই আখ্যায়িকার মূল সুরটি বাজিয়া উঠিল। শৈবলিনী চায় আত্ম পরিতৃপ্তি—প্রতাপ দিতে চায় প্রেমের পাদপীঠে নিজেকে বিসর্জ্জন। ইহার পর তৃতীয় পরিচ্ছেদে দেখা গেল চন্দ্রশেখর শর্ম্মা নামক জনৈক নৌকারোহী প্রতাপকে বাঁচাইলেন। সঙ্গে করিয়া তাহাকে গৃহে রাখিতে গেলেন। সেখানে শৈবলিনীকে দেখিয়া বিমুগ্ধ হইলেন। চন্দ্রশেখর জ্ঞানার্জ্জনের বিঘ্ন ঘটিবে ভাবিয়া এতদিন দারপরিগ্রহ করেন

নাই। এখন মাতৃবিয়োগ ঘটায় সাংসারিক সুবিধার খাতিরে বিবাহ করিলেন। তাঁহার সঙ্কল্প ছিল "সুন্দরী বিবাহ করা হইবে না; কেন না, সুন্দরীর দ্বারা মন মুগ্ধ হইবার সম্ভাবনা।" তিনি সুন্দরী বিবাহ করিয়া ভুল করিলেন। অবশ্য তিনি যে ভয়ে সুন্দরী বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন না, সেদিক হইতে তাঁহার কোন অনিষ্ট হইল না; কিন্তু যে সুন্দরীকে বিবাহ করিলেন তাহার হৃদয় যে আর একজনকে প্রদত্ত হইয়াছে, ইহা না জানিয়া বিবাহ করায় তাঁহার সাংসারিক সুখ স্থায়ী হইল না। সেকথা আরও বিশেষভাবে পরে আলোচনা করা যাইবে।

প্রথম খণ্ডের নাম দেওয়া হইয়াছে "পাপীয়সী"। প্রথমেই আমরা একটি মুশলমান যুবতীর সাক্ষাৎ লাভ করি। ইনি "বালিকার ন্যায় সুকুমার" দলনী, মীরকাসেম খাঁর অন্যতমা বেগম। এই সাধ্বী মুশলমান রমণী বহুবল্লভ নবাবের একনিষ্ঠ প্রেমের অধিকারিণী না হইয়াও যে সতী শিরোমণি তাহার আভাস প্রথম পরিচ্ছেদেই পাওয়া যায়। "যদি তাই ঈশ্বরের ইচ্ছা, তবে যে যাকে পায়, সে তাকেই চায় না কেন? যাকে না পায়, তাকে চায় কেন?" দলনীর এই উক্তি শৈবলিনীর প্রাণের কথাও ব্যক্ত করে। এই উক্তির ভিতর উপন্যাসের আলোচ্য সমস্যার ইঙ্গিতও নিহিত রহিয়াছে। নারী-শিরোমণি দলনীর চরিত্রের একটু আভাস দিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র পাপীয়সী শৈবলিনীর পাপ প্রবৃত্তির পরিচয় দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যেন তাহার পাপের চিত্র গাঢ় মসীবর্ণ করিবার জন্য পটভূমিতে (Back ground) "দলনী" চরিত্রের এই উজ্জ্বল কিরণ সম্পাত করিলেন। চন্দ্রশেখর বিদ্যাচর্চ্চায় সতত মগ্ন থাকেন। শৈবলিনীর প্রতি তাঁহার হৃদয়ের প্রগাঢ় প্রেম

প্রথম খণ্ড

কোন দিন চপলভাবে প্রকাশ করেন নাই। ইহাতে শৈবলিনীর প্রেমপিপাসা মিটিল না। পুরন্দরপুরে যাইতে পারিলে প্রতাপকে পাইতে পারে, এই আশায় আশান্বিতা হইয়া শৈবলিনী লরেন্স ফষ্টরের সহিত গৃহ হইতে পলায়ন করিল। শৈবলিনীর প্রতিবেশিনী "সুন্দরী" নিঃস্বার্থ প্রণয়ের একটি উজ্জ্বল চিত্র। প্রকৃত সখী কিরূপে নিজের বিপদকে তুচ্ছ করিয়া সখীর উপকারের চেষ্টা করে, তাহা আমরা সুন্দরীর চরিত্রে দেখিতে পাই। সুন্দরীর সহিত কথোপকথনে শৈবলিনীর মর্ম্মকথা প্রকাশ পাইয়াছে।

দ্বিতীয় খণ্ডের নাম দেওয়া হইয়াছে "পাপ"। এই খণ্ডে শৈবলিনী ও দলনার অদৃষ্ট একসূত্রে গ্রথিত হইয়াছে। ইংরাজের সহিত নবাবের

দ্বিতীয় খণ্ড

যুদ্ধ বাধিলে নবাবের বিপদ অবশ্যম্ভাবী, ইহা অনুভব করিয়া দলনী যুদ্ধ-বাসনা ত্যাগ করাইবার জন্য নবাবের সেনাপতি গুর্‌গন্ খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল। গুর্‌গন্ তাহার ভাই একথা অন্য কেহ জানিত না। পাপাত্মা গুর্‌গন্ ইংরাজের সহিত যুদ্ধ বাধাইয়া নবাবকে রাজ্যচ্যুত করিবার বাসনা করিয়াছিল। সুতরাং সে দলনীর অনুরোধ মত যুদ্ধ বন্ধ রাখিতে স্বীকার করিল না। পক্ষান্তরে দলনী যাহাতে অন্তঃপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে না পারে তাহারও ব্যবস্থা করিল। দলনী মহা বিপদে পড়িল। এমন সময় ব্রহ্মচারিবেশী চন্দ্রশেখর দলনীকে প্রতাপের বাসায় আশ্রয় দেন। প্রতাপ চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীর সন্ধানে আসিয়া মুঙ্গেরে বাসা করিয়াছিলেন।

প্রতাপ সুন্দরীর ভগিনী রূপসীকে বিবাহ করিয়াছেন। তিনি সুন্দরীর নিকট শৈবলিনীর বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন। চন্দ্রশেখর তাঁহার প্রাণ-রক্ষক। তিনি নানাভাবে তাঁহার উন্নতির সাহায্য করিয়াছেন। এখন

প্রতাপ একজন প্রতাপশালী জমিদার। প্রতাপ ফষ্টরের নৌকা হইতে অপূর্ব্ব কৌশলে শৈবলিনীকে উদ্ধার করিলেন। তাঁহার ভৃত্য রাম-চরণ শৈবলিনীকে প্রতাপের শয়নকক্ষে স্থান করিয়া দিল। প্রতাপ এ কথা জানিতেন না। তাঁহার আদেশ ছিল অন্যরূপ। তিনি শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া শৈবলিনীকে দেখিয়া চমকিত হইলেন। শৈবলিনী প্রতাপের নিকট স্বীয় পাপাভিলাষ ব্যক্ত করিল। সে বলিল, "তুমি কি জাননা যে, তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে, যদি কখনও তোমায় পাইতে পারি, এই আশায় গৃহত্যাগিনী হইয়াছি? নহিলে ফষ্টর আমার কে?" শুনিয়া প্রতাপের মাথায় বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি বৃশ্চিকদষ্টের ন্যায় পীড়িত হইয়া সে স্থান হইতে বেগে পলায়ন করিলেন।" এই সময়ে দুইজন ইংরাজ আসিয়া প্রতাপ ও রামচরণকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল। তাহারা দলনীকেও শৈবলিনীভ্রমে লইয়া গেল। এদিকে, শৈব-লিনী যে আশায় গৃহত্যাগ করিয়াছিল. তাহা পূর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই দেখিয়া অনুশোচনায় দগ্ধ হইতে লাগিল। এই খণ্ডে একদিকে পাপাত্মা গুরগন্ ও অন্যদিকে পাপীয়সী শৈবলিনীর পাপাভিলাষ ব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া ইহার নামকরণ যোগ্যই হইয়াছে।

তৃতীয় খণ্ডের নাম "পুণ্যের স্পর্শ"। পূর্ব্ব খণ্ডে শৈবলিনীর অনু-শোচনার উদয় হয়, কিন্তু তাহা ক্ষণস্থায়ী। আশাভঙ্গে প্রথমে তাহার

তৃতীয় খণ্ড

আত্মহত্যার ইচ্ছা হইল, পরে ভাবিল "না, আজ নহে। মরি ত সেই বেদগ্রামে গিয়া মরিব। সুন্দরীকে বলিব যে, আমার জাতি নাই, কুল নাই, কিন্তু এক পাপে আমি পাপিষ্ঠা নহি। তার পর মরিব।" স্বামীর নিকট কি বলিয়া আত্মদোষ ক্ষালন করিবে, তাহা ভাবিয়া পাইল না। অনুশোচনার পর সাধারণতঃ মনে পুণ্যের বাতাস

প্রবাহিত হয়। এই খণ্ডের প্রথমেই আমরা ব্রহ্মচারী চন্দ্রশেখর ও তাঁহার গুরু রমানন্দ স্বামীর সাক্ষাৎ লাভ করি। রমানন্দ নানাভাবে চন্দ্রশেখরকে বুঝাইলেন পরহিতব্রত শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। চন্দ্রশেখর গুরুর নিকট সেই মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। চন্দ্রশেখর শৈবলিনীর অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহাকে পাপপঙ্ক হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবেন, আখ্যায়িকাকার যেন সেই সঙ্কেত প্রদান করিলেন। শৈবলিনীর মনে অনুশোচনার উদয় হইলেও সুযোগ পাইয়া সে আবার এক নূতন আশায় মুগ্ধ হইল। দলনীর সংবাদ পাইয়া নবাব তাহাকে আনিবার জন্য প্রতাপের বাসায় শিবিকা পাঠান। প্রতাপের বাসা হইতে দলনীকে ইংরাজেরা শৈবলিনী ভ্রমে লইয়া গিয়াছিল। সেখানে এখন শৈবলিনী ভিন্ন আর কেহ ছিল না। নবাবের অনুচরেরা তাহাকে বেগম মনে করিয়া লইয়া গেল। নবাবের নিকট সে আপনাকে প্রতাপের পত্নী রূপসী বলিয়া পরিচয় দিল, এবং তাহাকে তাহার স্বামীর নিকট প্রেরণ করিবার জন্য নবাবকে অনুরোধ করিল। প্রতাপের আশায় শৈবলিনী একবার দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়াছিল ফষ্টরের সঙ্গে পলায়ন করিয়া, আজ আবার নবাবের সম্মুখে এক দুঃসাহসিক কার্য্য করিবার প্রস্তাব করিল। বলিল, "আমাকে একখানা দ্রুতগামী নৌকা ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়া সাহায্য করিলে আমি আমার স্বামীর উদ্ধারের চেষ্টা করি।" নবাব তাহার দুঃসাহসিকতায় বিস্মিত হইলেন; কিন্তু শৈবলিনীর কথায় সম্মত হইলে তাঁহার কোন ক্ষতি নাই ভাবিয়া তিনি কৌতূহলবশে তাহাকে নৌকা হাতিয়ার ইত্যাদি দিলেন। শৈবলিনী কিছু দূরে নৌকা রাখিয়া পাগলিনীবেশে প্রতাপের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল এবং পরামর্শ করিয়া নদীতে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। প্রতাপ তাহার প্রাণরক্ষার অছিলায় তাহার পশ্চাৎ

লাফাইয়া পড়িলেন। আবার দুইজনে বহুদিন পরে গঙ্গাবক্ষে সন্তরণ! প্রতাপ শৈবলিনীকে সেই বাল্যকালের প্রিয় সম্বোধন "শৈ—সই" বলিয়া ডাকিলেন। শৈবলিনীর পূর্ব্বস্মৃতি মনোমধ্যে উদিত হইল। প্রতাপ বুঝিলেন তিনি জীবিত থাকিতে শৈবলিনীর সুখের আশা নাই। তাই তিনি বলিলেন, "আমি উঠিব না, আজি মরিব।" শৈবলিনী তাঁহাকে মরিতে দিল না; বলিল, "কি চাও, প্রতাপ? যা বল, তাই করিব।" প্রতাপ শপথ করাইয়া লইলেন যে, শৈবলিনী তাঁহাকে ভুলিবে। পরে উভয়ে গিয়া তীরে উঠিল। রমানন্দ স্বামী তাহাদের অগোচরে তাহাদের উপর দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। শৈবলিনী ছিপ হইতে অলক্ষ্যে পলাইয়াছিল। এবার তাহার মনে কোন অসদভিপ্রায় ছিল না। সে জীবন-নদীতে বিপরীত তরঙ্গবিক্ষেপ অনুভব করিতে লাগিল। পুণ্যের বাতাস তাহাকে প্রথমবার স্পর্শ করিল। স্বেচ্ছায় সে এখন প্রায়শ্চিত্তে প্রবৃত্ত হইল। পর্ব্বতের উপর ঝড় বৃষ্টিতে অন্ধকার রাত্রে তাহার দুরবস্থার একশেষ হইল। সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারে পুণ্যবান চন্দ্রশেখরের স্নেহশীতল পবিত্র হস্ত শৈবলিনীর অঙ্গ স্পর্শ করিল। শৈবলিনীর অন্তরে বাহিরে পুণ্যের স্পর্শ লাভ ঘটিল। 'পুণ্যের স্পর্শ' নাম এই জন্য সার্থক হইয়াছে।

চতুর্থ খণ্ড

এই খণ্ডের নাম 'প্রায়শ্চিত্ত'। প্রতাপ শৈবলিনীকে দেখিতে না পাইয়া ভাবিলেন, সে ডুবিয়া মরিয়াছে। এখন সকল আশায় বঞ্চিতা হইয়া মরা তাহার পক্ষে অসম্ভব নয়। তাহার মৃত্যুর জন্য প্রতাপ প্রথমে নিজেকে দোষী করিলেন—পরে ভাবিলেন, চন্দ্রশেখর দোষী—নিজ পত্নী রূপসীর উপর একটু রাগ করিলেন—সুন্দরীর উপরও রাগ হইল—ফষ্টরের উপর রাগের সীমা রহিল না—ক্রমে 'ইংরাজ

জাতির উপর প্রতাপের অনিবার্য্য ক্রোধ জন্মিল।' তিনি ইংরাজের উচ্ছেদ সাধনে দৃঢ়সংকল্প হইলেন। এদিকে শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছে। এই খণ্ডের তিনটি পরিচ্ছেদে তাহার প্রায়শ্চিত্তের কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পর্ব্বতের একটি অন্ধকার নিঃশব্দ গুহামধ্যে চন্দ্রশেখর গুরুর উপদেশমত শৈবলিনীকে রাখিয়া আসিয়াছেন। সেখানে শৈবলিনী একাকিনী। "চিত্ত নিতান্ত বিকল, নিতান্ত বলশূন্য। তাহার উপর শারীরিক ক্লান্তি। সে অর্দ্ধ নিদ্রাভিভূত অর্দ্ধজাগ্রদবস্থায় সেখানে পড়িয়া রহিল।" এইখানে আখ্যায়িকাকার স্বপ্নে শৈবলিনীর নরকযন্ত্রণা ভোগের বীভৎস ভয়াবহ দৃশ্য দেখাইয়াছেন। আজন্মার্জ্জিত নরকের সংস্কার পাপীর মনে কি মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণার সৃষ্টি করে, এখানে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। শৈবলিনী সেই যন্ত্রণায় কাতর হইয়া মুক্তির উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। রমানন্দ স্বামী অলক্ষ্যে থাকিয়া তাহাকে মুক্তির উপায় বলিয়া দিলেন। দ্বাদশবর্ষ কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা তাহার পাপক্ষয় হইবে। স্বামী-সন্দর্শনের বাসনা তাহার মনোমধ্যে প্রবল হইলে আদেশ হইল, "সপ্তাহকাল দিবারাত্র গুহামধ্যে একাকিনী থাকিয়া স্বামীর ধ্যান কর।" শৈবলিনীর পাপ তাহার হৃদয়ে; এযাবৎ কোন পাপকর্ম্ম তদ্দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় নাই। সেই জন্য বঙ্কিমচন্দ্র হৃদয়ের পাপ সমূলে উৎপাটন করিবার জন্য এই আধ্যাত্মিক উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। এইখানে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাচ্য মনের সন্ধান মিলে। আধুনিক জড়বাদী বাস্তব-পন্থীদিগের সহিত তাঁহার এইখানে প্রভেদ। তৃতীয় পরিচ্ছেদে তিনি বলিতেছেন, "যে এ ব্রতের পরামর্শ দিয়াছিল, সে মনুষ্যচিত্তের সর্ব্বাংশদর্শী সন্দেহ নাই। নির্জ্জন, নীরব, অন্ধকার, মনুষ্যসন্দর্শন রহিত, তাহাতে আবার শরীর ক্লিষ্ট, ক্ষুধাপীড়িত, চিত্ত

অন্যচিন্তাশূন্য ; এমন সময়ে যে বিষয়ে চিত্ত স্থির করা যায়, তাহাই জপ করিতে করিতে চিত্ত তন্ময় হইয়া উঠে।” শৈবলিনী স্বামীর ধ্যান করিতে করিতে স্বামীর প্রতি ভক্তি ·বিশ্বাস ফিরিয়া পাইল। তাহার চিত্তে “চিরপ্রবাহিত নদী ফিরিল, পাহাড় ভাঙ্গিল, সমুদ্র শোষিল, বায়ু স্তম্ভিত হইল। শৈবলিনী প্রতাপকে ভুলিয়া চন্দ্রশেখরকে ভালবাসিল।” সপ্তাহান্তে স্বামি-সন্দর্শন ঘটিল। শৈবলিনী স্বামীর নিকট নিজের মর্ম্ম-কথা বিবৃত করিল ও পুনশ্চ নরকের দৃশ্যে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। মূর্চ্ছাভঙ্গের পর দেখা গেল, শৈবলিনী উন্মাদিনী হইয়া গিয়াছে। চন্দ্র-শেখর পরমস্নেহে তাহাকে লইয়া চলিলেন।

পঞ্চম খণ্ডের নাম “**প্রচ্ছাদন**”। এইখানে মূল আখ্যায়িকা স্থগিত রাখিয়া গ্রন্থকার দলনী বেগমের কথাই সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন।

পঞ্চম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়ে দলনীর স্বামীভক্তি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক-তর উজ্জ্বলভাবে দেখান হইয়াছে—কুল্‌সমের সহিত কথোপকথনে। নবাবের আদেশ পাইয়া মহম্মদ তকি মুরশিদাবাদে ইংরাজের নৌকা আটক করে। সেখানে যুদ্ধের আশঙ্কায় ইংরাজেরা পীড়িত ফষ্টর ও স্ত্রীলোকদিগকে রাখা অনুচিত বিবেচনা করিয়া তাহাদিগকে রেসি-ডেন্সিতে প্রেরণ করে। ফষ্টর মুশলমানদিগের ভয়ে রেসিডেন্সিতে না গিয়া সোজা নৌকা চালাইয়া দিল। পশ্চাতে একখানি নৌকা দেখিয়া ভাবিল, মুশলমানদিগের নৌকা বেগমকে উদ্ধার করিবার জন্য অনুসরণ করিতেছে। তাহার মনে হইল, দলনীকে তীরে নামাইয়া দিলে আর কোন গোল থাকিবে না। এই দুর্বুদ্ধির বশে সে দলনীকে তীরে নামা-ইয়া দিয়া নৌকা চালাইয়া দিল। দলনী একাকিনী। পশ্চাতের যে নৌকাকে নবাবের নৌকা ভাবিয়াছিল তাহা নবাবের নয়। সুতরাং সে

নৌকা তাহাকে ছাড়াইয়া চলিয়া গেল। দলনী মহা বিপদে পড়িল। সেই নির্জ্জন গঙ্গাতীরে অন্ধকার রাত্রে তাহার প্রাণসংশয় ঘটিল। সেই অবস্থায় চন্দ্রশেখর তাহাকে আবার রক্ষা করিলেন। তৃতীয় পরিচ্ছেদে বিশ্বাসঘাতক গুর্‌গনের শেঠভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত গুপ্ত ষড়যন্ত্রের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে দলনীর সর্ব্বনাশের সূত্রপাত করা হইয়াছে। মহম্মদ তকি নৌকায় দলনীকে না পাইয়া ভয়ে নবাবের নিকট মিথ্যা সংবাদ পাঠাইল। সে লিখিল, "বেগম আমিয়টের উপপত্নীস্বরূপ নৌকায় বাস করিতেন। একথা তিনি স্বীকার করিতেছেন। তিনি মুঙ্গেরে যাইতে অসম্মত।" এদিকে চন্দ্রশেখর দলনীর স্বামি-সন্দর্শনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা দেখিয়া তাহাকে মহম্মদ তকির নিকট পাঠাইয়া দিলেন। মূল বিষয়ের উপর কোন আলোকপাত হয় নাই বলিয়া এই খণ্ডের নাম "প্রচ্ছাদন"।

ষষ্ঠ বা শেষ খণ্ডের নাম "সিদ্ধি"। এই খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার পূর্ব্বকথা বলিয়াছেন। শৈবলিনীর নিকট ও দলনীর নিকট চন্দ্রশেখরের উপস্থিতি আকস্মিক বলিয়া কতকটা অমানুষিক ও অবিশ্বাস্য বলিয়া বোধ হয়। এই বিজ্ঞানের যুগে মানুষ অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস করিতে চায় না। প্রকৃত তথ্য-সম্বন্ধীয় জ্ঞানের অভাবে আমরা অনেক সময় প্রকৃত ঘটনাকেও অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে করি; কিন্তু ভিতরের তথ্য অবগত হইলে আর সে অবিশ্বাস থাকে না। সেইজন্যই গ্রন্থকার এইখানে কিঞ্চিৎ কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য হইয়াছেন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দলনীর শোচনীয় পরিণামের কথা বর্ণিত হইয়াছে। নবাব মহম্মদ তকির পত্র পাইয়া ক্রোধে আদেশ পাঠাইলেন, "তাহাকে (দলনীকে) সেইখানে বিষপান করাইয়া বধ করিও।" দলনী

ষষ্ঠ খণ্ড

স্বামীর আদেশ পালন করিতে দ্বিধা করিল না। ইতিমধ্যে নবাব কুল্‌সমের নিকট বেগম-সংক্রান্ত প্রকৃত তথ্য অবগত হইয়া অনুশোচনায় দগ্ধ হইতে লাগিলেন। নবাবের আদেশে তকি খাঁ, ফষ্টর, শৈবলিনী ও ব্রহ্মচারীকে আনিবার জন্য দুইজন রাজকর্ম্মচারী যাত্রা করিলেন। ফষ্টর ইতিমধ্যে ইংরাজের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া মীরকাসেমের সৈন্যদলেই সমরু নামক এক-জন জার্ম্মাণ সেনার অধীনে কর্ম্মগ্রহণ করিয়াছিল। সে সহজে ধৃত হইল। পঞ্চম ও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে শৈবলিনীর কথার পুনরায় অবতারণা করা হইয়াছে। চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে তাঁহার স্বগ্রাম বেদগ্রামে লইয়া গিয়া রমানন্দ স্বামীজির উপদেশ মত চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। উন্মাদিনী শৈবলিনীর অবস্থা দেখিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কাতর হইল সুন্দরী। এইখানে আমরা তাহার স্নেহময় হৃদয়ের পরিচয় পাই। প্রতাপও মুঙ্গের হইতে আসিয়া শৈবালনাকে দেখিয়া গেল। রমানন্দ স্বামী আসিয়া যোগবলে শৈবলিনীর মনের কথা চন্দ্রশেখরের নিকট বিবৃত করাইলেন এবং তাহার উন্মত্ততা আরোগ্য করিলেন। শৈবলিনী, স্বামী-জির যোগবলে জানিতে পারিল নবাবের সৈন্য তাহাকে লইতে আসিতেছে। সপ্তম পরিচ্ছেদে রমানন্দ স্বামীর আধ্যাত্মিক শক্তিতে বশীভূত হইয়া ফষ্টর নবাবের দরবারে শৈবলিনী ও দলনীর পবিত্রতার সাক্ষ্য দিল। নবাব যখন তাম্বুতে দরবার করিতেছিলেন তখন অতর্কিতে ইংরাজ আসিয়া গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিল। ইহার পর প্রতাপ সেই বিপদের মুখ হইতে চন্দ্রশেখর, শৈবলিনী ইত্যাদিকে উদ্ধার করিলেন। প্রতাপ শৈবলিনীর সহিত কথাবার্ত্তায় জানিতে পারিলেন, এখনও তাহা হইতে শৈবলিনীর ভয়ের কারণ আছে। শৈবলিনী বলিয়াছিল, "যতদিন তুমি এ পৃথিবীতে থাকিবে, আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ করিও না।

স্ত্রীলোকের চিত্ত অতি অসার, কত দিন বশে থাকিবে জানি না। এ জন্মে তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও না।” প্রতাপ জন্মশোধ শৈবলিনীর নিকট বিদায় লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। রমানন্দ স্বামী প্রতাপকে যুদ্ধক্ষেত্রে মুমূর্ষু অবস্থায় বাহির করিলেন। প্রতাপের ত্যাগ তাঁহার মত সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসীকেও মুগ্ধ করিল। এই খণ্ডে যোগবলের সাহায্যে শৈবলিনী পাপবিমুক্তা হইয়া পতিপদে মনঃসংযোগে সিদ্ধি লাভ করিল। এতদ্ব্যতীত এই খণ্ডে অন্যান্য প্রধান চরিত্রগুলিও সাধনোচিত সিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সেই জন্য এই খণ্ডের নামকরণ হইয়াছে ‘সিদ্ধি”।

কোম্পানীর আমলে বাঙ্গালাদেশ

এই উপন্যাসখানির ঘটনাবলী মীরকাসেমের রাজত্বের শেষের দিকে সংঘটিত হয়। মীরকাসেম ১৭৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার নবাবপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পলাসীর সুপ্রসিদ্ধ যুদ্ধে সিরাজ-দ্দৌলা পরাজিত হইবার পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালার নবাবী মীরজাফরকে প্রদান করে। বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর অতি অল্পকাল মধ্যেই স্বকীয় পাপের প্রতিফল প্রাপ্ত হইয়াছিল। কোম্পানী তাহাকে অপদার্থ দেখিয়া তৎপরিবর্ত্তে তাহার জামাতা মীর-কাসেমকে নবাবীপদে অভিষিক্ত করিয়াছিল।

তখন একটা ভীষণ রাষ্ট্রবিপ্লব চলিতেছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তখন সবেমাত্র ধীর পদসঞ্চারে রাষ্ট্রীয় মার্গে পদার্পণ করিতেছে। ইংরাজ রাজত্বের ভিত্তি স্থাপনের জন্য চতুর্দ্দিক হইতে মালমশলা আমদানী করা হইতেছে। পলাসীর যুদ্ধে এই ভিত্তির মূল প্রস্তরখণ্ড প্রোথিত হইলেও তখনও নানাভাবে পদে পদে কোম্পানী বাধা পাইতেছিল। মীরজাফর কোম্পানীর রাজসূয় যজ্ঞের ইন্ধন-রূপ রাজস্ব উপযুক্ত ভাবে সরবরাহ করিতে না পারায় কোম্পানী অধিক লাভের আশায় গোপনে গোপনে ষড়যন্ত্র করিয়া মীরকাসেমকে নবাবীপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল।

তখন কোম্পানীর বাণিজ্য পূর্ণবেগে চলিতেছিল। কলিকাতা, কাসিমবাজার, আজিমাবাদ (পাটনা), মুঙ্গের প্রভৃতি স্থানে তাহাদের বাণিজ্য কুঠি স্থাপিত ছিল। "সিরাজদ্দৌলার অধঃপতন সাধন করিবার সময় ইংরাজেরা ভাবিয়াছিলেন—রাষ্ট্রবিপ্লবে ইংরাজের অবাধ বাণিজ্য সংস্থাপিত হইবে; ইংরাজশক্তি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইবে; ইংরাজের পদো-

ন্নতির সূত্রপাত হইবে; বাঙ্গালা বিহার-উড়িষ্যায় রামরাজ্য সুবিস্তৃত হইবে। মীরজাফর সিংহাসনে পদার্পণ করিতে না করিতেই সে মোহ-নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল! ইংরাজেরা সহসা সুপ্তোত্থিতের ন্যায় চাহিয়া দেখিলেন,—নিয়ত সমর-কোলাহলে লিপ্ত হইয়া ইংরাজের বাণিজ্য বিলক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে; ইংরাজ শক্তি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত না হইয়া, অর্থাভাবে ইংরাজ কুঠি উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে; ইংরাজের পদোন্নতির সূত্রপাত না হইয়া সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইয়াছে; বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যায় রামরাজ্য সুবিস্তৃত না হইয়া, অহিফেনাসক্ত বৃদ্ধ মীর-জাফর ও তাঁহার কুক্রিয়াসক্ত অশান্ত পুত্র মীরণের শাসনকৌশলে দেশের মধ্যে হাহাকার ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে!" "মীর কাসেম" (অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়)—পৃঃ ৬৩

বাঙ্গালার তদানীন্তন রাষ্ট্রীয় অবস্থা ও কোম্পানীর আর্থিক অবস্থার কতকটা আভাস উপর্য্যুক্ত বর্ণনা হইতে পাওয়া যায়। কোম্পানীর সহায়তায় বঙ্গের রাজপদ প্রাপ্ত হইলেও মীরকাসেম কোম্পানীর উপর প্রসন্ন ছিলেন না। তিনি 'কণ্টকেনৈব কণ্টকং' নীতি অনুসরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন; কিন্তু ঈশ্বরের অভিপ্রায় ছিল অন্যরূপ। মীর-কাসেম ভাবিয়াছিলেন ইংরাজের সহায়তায় রাজপদ লাভ করিয়া ধীরে ধীরে তিনি মোগল শাসন-শক্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবেন। সেই উদ্দেশ্যে নবাবী পাইয়াই তিনি ইংরাজ দমনের চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছিলেন। সিংহাসনে পদার্পণ করিবার অনতিকাল পরেই তিনি বুঝিলেন তাঁহার আশা সুদূর পরাহত। রাজকোষ অর্থশূন্য।

কোম্পানীর তদানীন্তন কর্ম্মচারীদিগের চরিত্র প্রশংসনীয় ছিল না। তাহারা স্বজাতি ও স্বদেশের গৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্য নানাপ্রকার ঘৃণ্য

গুপ্ত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইতে কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। অনেক ইংরাজ ঐতিহাসিক একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। সেই জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র (১ম খঃ। ৩য় পরিচ্ছেদে) বলিয়াছেন, "বঙ্গীয় ইংরাজদিগের মধ্যে তখন ধর্ম্ম লুপ্ত হইয়াছিল।" "এই সময়ে যে সকল ইংরেজ বাঙ্গালায় বাস করিতেন, তাঁহারা দুইটিমাত্র কার্য্যে অক্ষম ছিলেন। তাঁহারা লোভ-সংবরণে অক্ষম এবং পরাভব স্বীকারে অক্ষম।.... যাঁহারা ভারতবর্ষে প্রথম ব্রিটেনীয় রাজ্য সংস্থাপন করেন, তাঁহাদিগের ন্যায় ক্ষমতাশালী এবং স্বেচ্ছাচারী মনুষ্য-সম্প্রদায় ভূমণ্ডলে কখনও দেখা দেয় নাই।" কথাগুলি যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য তাহা তৎকালীন বাঙ্গালার ইতিহাস পাঠ করিলেই বুঝা যায়।

নানাকারণে মীরকাসেম ইংরাজের উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন। ইংরাজকে ভারত হইতে বিতাড়িত করাই ছিল তাঁহার আন্তরিক কামনা। তিনি ইংরাজকে হাড়ে হাড়ে চিনিয়াছিলেন। "তুমি বালিকা, ইংরেজ কি, তাহা জান না।" (৩য় খঃ। ৩য় পরিঃ) চিনি-লেও কিন্তু তিনি মনের বাসনা চরিতার্থ করিতে পারেন নাই। তাঁহার কর্ম্মচারিগণের বিশ্বাসঘাতকতা ও অর্থাভাব হইয়াছিল তাঁহার কালস্বরূপ। যে আরমানী সেনানায়কগণের হস্তে বিশ্বাস করিয়া তিনি তোপখানার সমস্ত ভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন, তাহাদের অগ্রণী ছিলেন খোজা গ্রেগরী বা গর্গিন্ খাঁ। এই গর্গিন্ গোপনে গোপনে ইংরাজের সহায়তা সাধন করিয়াছিলেন; তাহারই ফলে ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে "উধূয়া-নালার" (উদয় নালা নহে) যুদ্ধে মীর কাসেম পরাস্ত হন এবং তাঁহার সমস্ত আশা ভরসা জলবুদ্বুদবৎ বিলীন হইয়া যায়।

তখন যে সমস্ত ভাগ্যান্বেষী ইউরোপীয় যুবক এদেশে আসিত,

তাহাদের মধ্যে অনেকেই স্বদেশের মায়া পরিত্যাগ করিয়াই আসিত। অনেকে ভারতীয় রমণীকে বিবাহ করিতেন, অনেকে আবার বিবাহ না করিয়াও তাহাদের সহিত স্বামী-স্ত্রীভাবে বসবাস করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্র ফষ্টরের মুখে বলাইয়াছেন " যে সকল ইংরেজ এদেশে আসিয়া পুরোহিতকে ফাঁকি দিয়া বাঙ্গালী সুন্দরীকে এ সংসারের সহায় বলিয়া গ্রহণ করেন, তাঁহারা মন্দ করেন না।" ইংরাজদিগের দোষ যতই থাকুক, তাঁহাদের মধ্যে স্বজাতি-প্রেম ও স্বদেশ-হিতৈষিতা পূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল। ছলে বলে কৌশলে ভারতবর্ষকে গ্রাস করিবার ইচ্ছা তাঁহাদের মনে বলবতী ছিল। তাঁহাদের মনের মধ্যে একটা বীরত্বগর্ব্ব সর্ব্বদা সজাগ ছিল; "এইরূপে ব্রিটিশ পদাঘাতে সকল ভারতবর্ষ ভাঙ্গিয়া পড়ুক" (২য় খঃ। ৭ম পরিঃ) ইহাই ছিল পনর আনা ইংরাজের মনোভাব। অনেক ভাগ্যান্বেষী সৈনিক এদেশীয় রাজা ও নবাবের অধীনে সৈনিক বৃত্তি অবলম্বন করিত। ইহারা অনেক সময় বিশ্বাসঘাতকতাও করিত।

সে সময়ে বাঙ্গলা দেশে জলপথেই বেশী লোক যাতায়াত করিত। বড় বড় জমিদার, কুঠিয়াল সাহেব ও সরকারের অধীনে অনেক দ্রুতগামী ছিপ্, বজরা ইত্যাদি থাকিত। দেশে তখন বিলাসিতা মোটেই প্রবেশ লাভ করে নাই। তৎকালীন সামাজিক অবস্থার একখানি সুন্দর চিত্র অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের "সিরাজদ্দৌলা"র প্রথম পরিচ্ছেদে প্রদত্ত হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু ছাত্রগণের উহা পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

ঐতিহাসিক ভিত্তি

আখ্যায়িকাটির মধ্যে অনেকগুলি ঐতিহাসিক চরিত্রের অবতারণা করা হইয়াছে। মীরকাসেম, গুরগন্ খাঁ, মহম্মদ তকি খাঁ এই তিনটি প্রধান চরিত্র ছাড়া আরো কয়েকজন ঐতিহাসিক ব্যক্তির নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্, আমিয়ট্, গলষ্টন্, জনসন্, হে, ইলিশ এই কয়েকজন ইংরাজের নাম ইতিহাসে দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে আমিয়ট্, গলষ্টন্ ও জন্সনকে কার্য্যক্ষেত্রে দেখিতে পাই। অন্যান্য নামগুলির প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ মাত্র আছে। ডাইস সম্বর বা সমরুও ঐতিহাসিক ব্যক্তি। তিনি একজন লুথারেন জার্ম্মাণ। অক্ষয়কুমার বলেন তাহার নাম ছিল ওয়াল্টার রেণল্ড। আবার কেহ কেহ তাঁহাকে রীণহার্ড বা রীণহার্ট নামেও অভিহিত করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, তাহার নাম ছিল ডাইস্ সম্বর। এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক Wheeler তাঁহার *Early Records of British India* নামক গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন তাহা এখানে উদ্ধৃত করিলাম :—"The real name of this man was Walter Reinhardt. He deserted to the English and took the name of *Summer*; the soldiers changed his name to *Sombre* because of his evil expression. Subsequently he entered the Nawab's service."—Page 327, *foot note.* এই ব্যক্তি মীরকাসেমের অধীনে পাটনায় ইংরাজ হত্যা ব্যাপারে জহ্লাদের কার্য্য করিয়া ইতিহাসে চিরস্মরণীয় দুর্ণাম অর্জ্জন করিয়াছেন।

মহাতাব চন্দ্ জগৎশেঠ ও স্বরূপ চন্দ্ জগৎশেঠ উভয়ে

ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ইহারা ফতেচাঁদ জগৎশেঠের পৌত্র। "সয়ের মতাক্ষরীণ" গ্রন্থে মহাতাব চন্দের নাম মহাতাব রায় ও স্বরূপ চন্দের নামের পূর্ব্বে 'রাজা' উপাধি দেখা যায়। লরেন্স ফষ্টর, প্রতাপ, চন্দ্রশেখর, দলনী ইত্যাদির নাম ইতিহাসে পাওয়া যায় না, ইহারা সকলেই কাল্পনিক চরিত্র।

উপন্যাস খানিতে এতগুলি ঐতিহাসিক চরিত্রের সমাবেশ থাকিলেও ইহা খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস নহে। প্রধান চরিত্রগুলির অধিকাংশই কাল্পনিক। ঐতিহাসিক উপন্যাস না হইলেও বঙ্কিমচন্দ্র একটি বিষম ভ্রম করিয়াছেন। তাঁহার সেই ভ্রমের জন্য সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় "মীর কাসিম" নামক তাঁহার বিখ্যাত ঐতিহাসিক চিত্রের ১৮শ পরিচ্ছেদে বিশেষ অনুযোগ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান অপরাধ এই যে, তিনি মহম্মদ তকি খাঁর চরিত্রে কুরপনেয় কলঙ্ককালিমা ঢালিয়া দিয়াছেন। ঐতিহাসিক তকি খাঁর প্রভুভক্তি ও বীরত্বের কথা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত আছে। গোলাম হোসেনের মতাক্ষরীণে, মুস্তাফা খাঁর টীকায়, স্কটের ও ম্যালিসনের ইতিহাসে ও অন্যান্য সমসাময়িক লেখকগণের গ্রন্থে বিস্তৃত ভাবে সে কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কাটোয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে তকি খাঁ অদ্ভুত বীরত্ব দেখাইয়া প্রভুর জন্য প্রাণত্যাগ করেন। মুর্শিদাবাদের যে ব্যাপারে তকি খাঁর নাম জড়িত হইয়াছে সে ব্যাপারটিও ঐতিহাসিক; কিন্তু অক্ষয়কুমার বলেন, তকি খাঁ তখন মুর্শিদাবাদে ছিলেন না। সৈয়দ মহম্মদ খাঁ তখন মুর্শিদাবাদের শাসনকর্ত্তা। মুতাক্ষরীণের ইংরাজী অনুবাদে ৪৭৬ পৃষ্ঠায় পাদটীকায় দেখা যায়, তকি খাঁ মুর্শিদাবাদে ছিলেন না সত্য, কিন্তু তিনি মুর্শিদাবাদের হত্যার ব্যাপারের সহিত

সংযুক্ত ছিলেন। এই পাদটীকার কথাগুলি যে বঙ্কিমচন্দ্র অনুসরণ করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। পাদটীকায় আমিয়টকে নিমন্ত্রণ করার কথা আছে, বঙ্কিমচন্দ্র তাহা ৫ম খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছেন। পার্থক্য এই, উপন্যাসে তকি খাঁ নিজে নিমন্ত্রণ করিতেছেন, কিন্তু পাদটীকায় দেখা যায় তকি খাঁ আগা আলি তুর্ক নামক তাঁহার জনৈক বন্ধু ও কর্ম্মচারীকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য প্রেরণ করেন। তকি খাঁ তখন মুর্শিদাবাদ ও কাসিমবাজারের মধ্যবর্ত্তী "বাগরাটী" নামক স্থানে ছাউনি করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। অমিয়টকে সদলে মুঙ্গের পাঠাইবার আদেশ নবাব তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। এটুকু ঐতিহাসিক সত্য; কিন্তু ইহার পর তকির চরিত্রে যে মসীবর্ণ ক্ষেপণ করা হইয়াছে তাহা সর্ব্বথা অনৈতিহাসিক, সুতরাং নিন্দনীয়। মহম্মদ তকির পরিবর্ত্তে ফষ্টরের মত কোন কাল্পনিক চরিত্র সৃষ্টি করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসের কার্য্যসাধন করিলে ভাল হইত।

গুরগন্ খাঁ ষড়যন্ত্রকারীরূপে উপন্যাসে স্থান পাইয়াছে। ইতিহাসে দেখা যায় গুরগনের প্রকৃত নাম গ্রেগরী, বিকৃত নাম গর্‌গিন (Gurghin). গুরগনের শৈথিল্য ও ইংরাজপ্রীতি মীর কাসেমের পতনের অন্যতম কারণ সন্দেহ নাই; কিন্তু ইতিহাস তাহাকে ষড়যন্ত্রকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করে নাই। যাহা-হউক উপন্যাস যখন ইতিহাস নয়, তখন গুরগনের চরিত্র সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রকে দোষ দেওয়া যায় না। গুরগন্ ষড়যন্ত্রকারী না হইলেও মীর কাসেমের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী যে ছিল না, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

নবাব মীর কাসেমের নাম বাঙ্গালার ইতিহাসে মীর কাসিম হইয়াছে। নবাব হইয়া তিনি "নাসির-উল্-মোল্‌ক ইম্‌তিয়াজ উদ্দৌলা মীর মহম্মদ

কাসেম আলি খাঁ নস্‌রৎ জঙ্গ বাহাদুর" উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি মীর জাফরের জামাতা। ইংরাজের সহিত গুপ্ত ষড়যন্ত্র করিয়া অকর্ম্মণ্য শ্বশুরকে সিংহাসন হইতে অপসৃত করিয়া নবাব হন।

মীরকাসেম

মীরজাফর প্রভু সিরাজউদ্দৌলার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ইংরাজের সাহায্য করিয়াছিল। তাহার যোগ্য প্রতিফল সে ইংরাজের হাতেই পাইয়াছিল। বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সিংহাসন লাভের দৃষ্টান্ত মুশলমান ইতিহাসে বিরল নহে; কিন্তু মীরজাফরের ন্যায় স্বজাতি বিদ্বেষ ও স্বদেশদ্রোহের উদাহরণ সচরাচর দৃষ্ট হয় না। মীরকাসেম শ্বশুরের দৃষ্টান্ত দেখিয়া শ্বশুরের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য ছিল সাধু। ইংরাজের হস্ত হইতে স্বদেশ উদ্ধারের চেষ্টা স্বজাতিদ্রোহ নামে নিন্দিত হইতে পারে না। তবুও মীবকাসেম বিশ্বাসঘাতক। মীরকাসেমের অপরাধ ঐ পর্য্যন্ত। সিংহাসন লাভের পর হইতে তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে প্রজার মঙ্গল সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই ঐতিহাসিক চরিত্রটির গৌরবও বঙ্কিমচন্দ্র অক্ষুণ্ণ রাখেন নাই। তাঁহার দ্বারা তকি খাঁর মত প্রভুভক্ত বীর সেনাপতির স্বহস্তে বধসাধন করান উচিত হয় নাই। উপন্যাসের ষষ্ঠ খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে—"তোমরা শুন, এ রাজ্য আমার রক্ষনীয় নহে। এই বাঁদী যাহা বলিল, তাহা সত্য—বাঙ্গালার নবাব মূর্খ—তোমরা পার, সুবা রক্ষা কর আমি চলিলাম। আমি রুহিদাসের গড়ে স্ত্রীলোকদের মধ্যে লুকাইয়া থাকিব, অথবা ফকিরী গ্রহণ করিব।" নবাবের এই উক্তিতে কাব্যরস প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকিলেও ইহা মীরকাসেমের মত কর্ম্মতৎপর বীরের উপযুক্ত হয় নাই।

অনেকে মনে করিতে পারেন উপন্যাস ইতিহাস নহে; সুতরাং উপন্যাস

লিখিতে গিয়া ঐতিহাসিক সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার আবশ্যকতা নাই। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কাব্যে বা উপন্যাসে ঐতিহাসিক ঘটনার পারম্পর্য্য রক্ষিত না হইলে তত দূষণীয় হয় না বটে; কিন্তু ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি বিকৃত করিবার,—বিশেষতঃ উত্তম চরিত্রকে হীন প্রতিপন্ন করিবার অধিকার কাহারও নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের মত ইতিহাসে সুপণ্ডিত ঔপন্যাসিক "চন্দ্রশেখরে"র বিজ্ঞাপনে সয়ের মতাক্ষরীণের সশ্রদ্ধ উল্লেখ করিয়াও কেন ইহার অন্যথাচরণ করিলেন তাহা বুঝা দুষ্কর। ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমারের মতে মুশলমানদিগের প্রতি হিন্দু হৃদয়ের আন্তরিক অবজ্ঞাই ইহার কারণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

বস্তুনির্দ্দেশ

উপন্যাসখানির প্রধান বা মুখ্য বর্ণনীয় বস্তু শৈবলিনী, প্রতাপ ও চন্দ্রশেখরের প্রণয়, অপ্রধান বা গৌণবস্তু মীরকাসেম ও দলনী বেগমের প্রণয়। মুখ্য ব্যাপারটি গৌণ ব্যাপারকে আশ্রয় করিয়া ধীরে ধীরে পরিণতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে। গৌণ ব্যাপারের দ্বারা একটি ঐতিহাসিক আবহাওয়ার সৃষ্টি করা হইয়াছে। এই ঐতিহাসিকতার মূল্য উপরে নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এই ঐতিহাসিক আবহাওয়া ছাড়া দলনীর পতিপ্রাণতা শৈবলিনীর স্বামীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাকে অধিকতর প্রস্ফুটিত করিবার সাহায্য করিয়াছে।

তিনখানি পারিবারিক উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র দাম্পত্য-প্রণয়ের পবিত্রতা বর্ণনা করিয়াছেন। এই পবিত্রতায় প্রত্যবায় ঘটিলে তাহার ফল যে কিরূপ বিষময় হয় তাহাই তিনি "বিষবৃক্ষে" দেখাইয়াছেন। "চন্দ্রশেখরে" দেখাইয়াছেন মানসিক ব্যভিচারও অপবিত্র এবং তাহার ফল বিষময় হইতে পারে। পরে "কৃষ্ণকান্তের উইলে" দেখাইলেন, স্ত্রী ব্যভিচার করিলে যেমন তাহার শাস্তি আছে, পুরুষ ব্যভিচারী হইলে তাহাকেও শাস্তি পাইতে হয়। ব্যভিচারী পুরুষ সতী স্ত্রীর সহিত পুনর্মিলিত হইতে পারে না। দাম্পত্য-প্রণয়ের পবিত্রতা রক্ষার জন্য স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই দায়িত্ব সমান।

প্রতাপ শৈবলিনী

বাল্য-প্রণয়

আখ্যায়িকার প্রথমেই আমরা প্রতাপ ও শৈবলিনীর বাল্যলীলার পরিচয় পাই। এই লীলার বর্ণনা সুদীর্ঘ না হইলেও অতি অল্পের মধ্যে কলাকৌশলী বঙ্কিমচন্দ্র এই দুইটি বালক বালিকার সুগভীর প্রণয়ের পরিচয় দিয়াছেন। শরৎচন্দ্র দেবদাস ও পার্ব্বতীর বাল্য সৌহার্দ্দও এমনি সুন্দর ভাবে তাঁহার অনবদ্য উপন্যাস 'দেবদাসে' দেখাইয়াছেন। প্রতাপ ও শৈবলিনীর ভালবাসাকে বালক বালিকার প্রণয় বলিয়া অনেকে হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন, সেই আশঙ্কায় গ্রন্থকার বলিতেছেন, "বালকের ন্যায় কেহ ভালবাসিতে জানে না।" কিন্তু এই বাল্যপ্রণয়ের উপর বুঝি কিছু অভিসম্পাত আছে। ইহা প্রায়ই সুমধুর মিলনে পর্য্যবসিত হয় না। 'বার্দ্ধক্যে বাল্যপ্রণয়ের স্মৃতিমাত্র থাকে'। এইরূপ বাল্য-প্রণয় সচরাচর দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহার সকলগুলিই জটিলতার সৃষ্টি করে না। তাহার কারণ সমস্ত বাল্যপ্রণয় বালকবালিকার মনে এরূপ গভীর ভাবে রেখাঙ্কন করে না। প্রতাপ জানিত তাহাদের বিবাহ হইবে না, সুতরাং সে কতকটা সাবধান হইতে পারিয়াছিল। কিন্তু 'শৈবলিনী মনে মনে জানিত প্রতাপের সঙ্গে আমার বিবাহ হইবে', সুতরাং সে প্রাণ

ভরিয়া প্রতাপকে ভালবাসিতে লাগিল। এই ভুলের জন্যই যত কিছু জটিলতার সৃষ্টি হইল। যখন শৈবলিনীর জ্ঞান জন্মিতে লাগিল, তখন সে বুঝিল "যে প্রতাপ ভিন্ন পৃথিবীতে সুখ নাই। বুঝিল, এজন্মে প্রতাপকে পাইবার সম্ভাবনা নাই।" প্রতাপ এই প্রণয় ব্যাপারে যে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল তাহা গ্রন্থকার প্রকাশ করিয়া না বলিলেও বুঝা যায় তাহার ভালবাসাও বড় কম ছিল না। দুইজনে 'গোপনে গোপনে পরামর্শ করে, কেহ জানিতে পারে না।' এই পরামর্শ যে তাহাদের আত্মহত্যার পরামর্শ তাহা পরে গঙ্গাবক্ষে সাঁতার দিতে দিতে 'আর কেন, এইখানেই'—শৈবলিনীর এই উক্তি হইতে বুঝা যায় তাহার পর প্রতাপ ডুবিল, শৈবলিনী ডুবিতে পারিল না, মৃত্যুর ভয়ে পিছাইয়া গেল। প্রতাপের প্রণয় যে শৈবলিনীর প্রণয় অপেক্ষা গভীর-তর ও উন্নততর এইখানেই আমরা সে পরিচয় পাইলাম। প্রণয়ের পাদপীঠে তাহার এই প্রথম আত্মবিসর্জন বিফল হইল।

চন্দ্রশেখর শৈবলিনী

আসর জমিল না

ব্রাহ্মণপণ্ডিত চন্দ্রশেখর শর্ম্মা পুঁথি পত্র লইয়াই থাকিতেন। যৌবনেও তাঁহার ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য দেখা যায় নাই। কিন্তু যে রূপের প্রভাবে মুনি ঋষিদিগেরও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে, সেই রূপপ্রবাহ তাঁহার সমুদ্রবৎ সুগম্ভীর হৃদয়ে তরঙ্গ তুলিল। চন্দ্রশেখর মুগ্ধ হইলেন। হয়ত তিনি মদন-শরাহত দেবাদিদেব চন্দ্রশেখরের মতই পুনরায় চিত্তস্থির করিতে পারিতেন, কিন্তু সাংসারিক অসুবিধা আসিয়া সেই রূপ মোহের সহিত একত্র হইয়া তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইল। সাংসারিক সুবিধার জন্য একটি যেমন তেমন কুমারীর পাণিগ্রহণ করিলেই চন্দ্রশেখরের চলিয়া যাইত; কিন্তু রূপমোহরূপ সামান্য পাপ তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া বিষম অনর্থ ঘটাইল।

গৃহ-ধর্ম্মের যে বিশৃঙ্খলা দূরীকরণার্থ তিনি বিবাহ করিলেন সে বিশৃঙ্খলা দূরীভূত না হইয়া দিন দিন জটিল হইয়া পড়িতে লাগিল। চন্দ্রশেখরের ন্যায় ব্যক্তির বিবাহ করা বিপজ্জনক। কারণ কেবল নিজের স্বার্থের জন্য বিবাহ করিলে তাহা সুখের হয় না। চন্দ্রশেখর চান বিদ্যাচর্চ্চা, তিনি চান নিজেকে রমণীর বন্ধন হইতে মুক্ত রাখিতে এবং চান সাংসারিক সুবিধা। এক্ষেত্রে বিবাহ না করিয়া পরিচারক দ্বারা

সাংসারিক সুবিধা করিয়া লওয়াই সঙ্গত। কারণ যে রমণীকে তিনি আনিলেন তাহার প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্যের অঙ্ক একবারে শূন্য নহে। অবশ্য আমরা পরে দেখিতে পাই চন্দ্রশেখরের হৃদয় শৈবলিনীতে অনুরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল কিন্তু তাহার মৌন প্রেম (সুন্দরীর কথা "কিনা বালকে যেমন খেলাঘরের পুতুলকে আদর করে তিনি স্ত্রীকে সেরূপ আদর করিতে জানেন না") শৈবলিনীর তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারিল না। বিবাহের পর আটবৎসর তাহাদের কিরূপে কাটিয়াছিল তাহা আমাদের অজ্ঞাত; কিন্তু আটবৎসরের পরের কথা হইতে অনেক কিছুই অনুমান করা যাইতে পারে। চন্দ্রশেখর দিবারাত্র শাস্ত্রানুশীলনে মগ্ন থাকিতেন, শৈবলিনী গৃহকর্ম্ম লইয়াই বোধ হয় থাকিত, স্বামীর পুঁথিগুলি সযত্নে তুলিত, স্বামীর পূজার পুষ্পপাত্র ভরিয়া দিত, মাঝে মাঝে সুন্দরী প্রভৃতি প্রতিবেশিনীদের সহিত গল্পসল্পও হয়ত করিত। রাত্রে স্বামীর আগেই ভোজন করিয়া তাহাকে শুইয়া পড়িতে হইত। 'এ বিষয়ে চন্দ্রশেখরের অনুমতি ছিল।' এখন চন্দ্রশেখর বুঝিয়াছেন তিনি শৈবলিনীকে বিবাহ করিয়া বিষম ভুল করিয়াছেন। 'আমার যে বয়স (তখন ৪০ বৎসর) তাহাতে আমার প্রতি শৈবলিনীর অনুরাগ অসম্ভব' 'আমি ত সর্ব্বদা আমার গ্রন্থ লইয়া বিব্রত, আমি শৈবলিনীর সুখ কখন ভাবি?' ভ্রম বুঝিতে পারিলেও কিন্তু তিনি 'ক্লেশসঞ্চিত পুস্তক-রাশি জলে ফেলিয়া দিয়া আসিয়া রমণী-মুখপদ্ম জন্মের সারভুত' করিতে পারিলেন না। "সুতরাং নিরপরাধিনী শৈবলিনী"কে তাঁহার "পাপের প্রায়শ্চিত্ত" করিতে হইল। (১ম খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদের শেষ অংশ দ্রষ্টব্য।)

এখানে প্রশ্ন উঠিবে, শৈবলিনী কি সত্যই নিরপরাধিনী? চন্দ্রশেখর

কি সকল পাপের জন্য দায়ী? এ প্রশ্ন দুইটি বড়ই গুরুতর। সামান্য কথায় ইহার উত্তর দেওয়া সম্ভবপর নহে। অতি আধুনিক ভাবুক বলিবেন,-শৈবলিনী বাল্যে প্রতাপকে ভালবাসিয়াছিল, সে জন্য তাহার অপরাধ কোথায়? তাহার মতামতের অপেক্ষা না করিয়া চন্দ্রশেখর তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, সুতরাং চন্দ্রশেখরের অপরাধই গুরুতর। শৈবলিনী প্রতাপকে পাইলে সে কখনই কলুষপঙ্কে নিমজ্জিত হইত না। ভালবাসার স্বাধীনতা স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই আছে। চন্দ্রশেখর শৈবলিনীর সে স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিয়া অপরাধী।

অন্যপক্ষে, চন্দ্রশেখর আধুনিক যুগের নরনারীর তুল্য অধিকারের পক্ষপাতী বলিয়া মনে হয় না। তিনি যে প্রাচীনপন্থী উদার হিন্দু তাহা তাঁহার শিক্ষা দীক্ষা প্রভৃতিতেই জানা যায়। তাহা হইলে তিনি শৈবলিনীকে নিরপরাধিনী এবং নিজেকে পাপের ভাগী বলিয়া মনে করেন কেন? ইহার উত্তর অতি স্পষ্ট। চন্দ্রশেখর এখানে অতি সহজ ভাবে চিন্তা করিতেছেন। শৈবলিনীর রূপ দেখিয়া ভাবিতেছেন তাহাকে বিবাহ করা তাঁহার উচিত হয় নাই। নারী, বিশেষতঃ রূপসী নারী, স্বামীর নিকট হইতে যেরূপ আদর সোহাগ পাইয়া থাকে, চন্দ্রশেখর তাহা শৈবলিনীকে দিতে পারেন নাই। সেইজন্য তিনি বিশেষ অনুতপ্ত হইয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছেন। তিনি তখন পর্য্যন্ত শৈবলিনীকে সম্পূর্ণ নিরপরাধ ও নিষ্পাপ বলিয়াই জানেন। নিজের আত্মসুখপরায়ণতা আজ তাঁহার নিকট বীভৎস ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়াই তিনি নিজেকে পাপী মনে করিতেছেন। এখানে চন্দ্রশেখর আধুনিক ভাবুকগণের ভাবে ভাবিত হইয়া এই প্রশ্নগুলি উত্থাপন করেন নাই, ইহা বলাই বাহুল্য।

প্রণয়-পূর্ব্ব বিবাহ হিন্দুসমাজে প্রচলিত নাই। সে অবস্থায় নরনারীর

বিবাহের পূর্ব্বে ভালবাসা উচিত নহে। যাহা উচিত তাহা সর্ব্বদা হয় না, এবং যাহা অনুচিত তাহা প্রায়ই ঘটে বলিয়া সংসারে এত জটিলতার সৃষ্টি হয়। শৈবলিনীর যখন প্রতাপের সহিত প্রণয় থাকা সত্ত্বেও ঘটনা-ক্রমে চন্দ্রশেখরের সহিত বিবাহ হইল, তখন তাহার কর্ত্তব্য কি? সে কি প্রতাপের স্মৃতি মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়া চন্দ্রশেখরকে ভালবাসিবে? শাস্ত্রকার বলিবেন, "তাহাই কর্ত্তব্য।" ভাবুক বলিবেন, "ভাবপ্রবণা নারী তাহা পারিয়া উঠিবে না। তোমাদের শাস্ত্রেই ত আছে—একবার যাহাকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছ সেই তোমার পতি। তাহাকে ভুলিয়া অন্যকে আত্মসমর্পণ করিলে তুমি সতী-ধর্ম্মচ্যুত হইবে। তবে আবার ওরূপ কথা বল কেন?" উত্তরটি অগ্রাহ্য করা চলে না। ইহার উত্তরে বলিতে হইবে, বিবাহের পূর্ব্বে বিচার বিবেচনা না করিয়া আত্মসমর্পণ করিলে সাবিত্রীর মত আসন্ন বিপদকে মাথায় তুলিয়া লইতে হইবেই। যাহারা সাবিত্রীর মত অসাধারণ নির্ভীকা ও ধৈর্য্যশীলা, অন্য কাহারও সহিত বিবাহে তাহাদের তীব্রভাবে বাধা দেওয়াই কর্ত্তব্য। বাধা না দিয়া প্রেমাস্পদ ভিন্ন অপর কাহারও সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইলে, তাহাকে সাধারণ স্ত্রীলোকের মত পূর্ব্বস্মৃতি বিসর্জ্জন দিয়া স্বামীকে ভালবাসিতে ও ভক্তিশ্রদ্ধা করিতে হইবে। ইহাই বোধ হয় আমাদের শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। পরেও দেখা যাইবে বঙ্কিমচন্দ্র সেই ভাবেই এই প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন। শৈবলিনী চন্দ্রশেখরের সহিত বিবাহে কোন আপত্তি উত্থাপন না করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিল। সুতরাং তাহার প্রতাপকে ভুলা উচিত ছিল। সে তাহা পারে নাই বলিয়াই অপরাধিনী। চন্দ্রশেখরের কিছু দোষ থাকিলেও তাহা জ্ঞানকৃত নহে, সুতরাং লৌকিক দৃষ্টিতে তিনি নিষ্পাপ।

শৈবলিনী ফষ্টর

দুরাশা

ভীমা পুষ্করিণীর শ্যামজলে জলক্রীড়ারতা শৈবলিনী ও সুন্দরীর কথোপকথনে শৈবলিনীর কৌতুকপ্রিয়তার এবং তৎসঙ্গে তাহার নির্ভীকতারও পরিচয় পাওয়া যায়। শৈবলিনীর অঙ্গুলি নির্দ্দেশানুসারে সুন্দরী একজন গোরাকে দেখিয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। এই সুন্দরীই আবার সৎকার্য্যে সাহস দেখাইতে পশ্চাৎপদ নয়, তাহা পরে দেখা যাইবে। শৈবলিনীর ফষ্টরের সহিত ব্যবহারে মনে হয় যেন দৃপ্ত সিংহী একটি ছাগশিশুর সহিত খেলা করিতেছে। ১ম খণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদে প্রকাশ ফষ্টরের সহিত শৈবলিনীর এই প্রথম সাক্ষাৎ নয়। "সেই অবধি শৈবলিনী ফষ্টরকে দেখিয়া পলাইত না—ক্রমে তাহার সহিত কথা কহিতেও সাহস করিয়াছিল।" লেখক এইখানে শৈবলিনীর কার্য্যের দোষ কীর্ত্তন করিয়া তাহার ও ফষ্টরের দুরভিসন্ধির আভাস দিয়াছেন। উভয়ের উদ্দেশ্য পৃথক্। ফষ্টর চায় শৈবলিনীকে 'ভজাইতে' —'অনেক বাঙ্গালী মেয়ে ধনলোভে ইংরেজ ভজিয়াছে—শৈবলিনী কি ভজিবে না?" (১ম খঃ। তৃতীয় পরিঃ)। আর শৈবলিনী চায় ফষ্টরকে অবলম্বন করিয়া তাহার অভীষ্ট প্রেমাস্পদকে লাভ করিতে। ফষ্টর সোজাসুজি শৈবলিনীর নিকট তাহার প্রস্তাব পাঠাইয়াছিল, কিন্তু

তাহার 'যত্ন বিফল হইল'। পরে ফষ্টর হঠাৎ বদলী হইয়া যাইবার সময় শৈবলিনী-রত্ন অপহরণ করিবার জন্য ডাকাইতি করিল। ইতিপূর্ব্বে শৈবলিনীর মনে কি ছিল, জানিবার উপায় নাই; কিন্তু পরে প্রতাপের সহিত কথোপকথনে প্রকাশ পাইয়াছে যে তাহার জন্যই সে ফষ্টরের সহিত বেদগ্রাম ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে (২য় খঃ। ৬ষ্ঠ পরিঃ)। চন্দ্রশেখরের সহিত কথায় প্রকাশ, "বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনা মিথ্যা কথা। আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক ফষ্টরের সঙ্গে চলিয়া আসিয়াছিলাম। ডাকাইতির পূর্ব্বে ফষ্টর আমার নিকট লোক প্রেরণ করিয়াছিল।" (৪র্থ খঃ। ৪র্থ পরিঃ)। ডাকাইতির প্রস্তাব শুনিয়া হয়ত শৈবলিনী হঠাৎ এই দুর্য্যোগকে সুযোগে পরিবর্ত্তিত করিতে সংকল্প করিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে ফষ্টরকে সে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল—ঘৃণা করিয়াছিল ("লরেন্স অর্থে বাঁদর" "দুই চক্ষের বিষ ফিরিঙ্গী" উক্তি স্মর্ত্তব্য)। এখন পতির অনুপস্থিতিতে প্রবল-প্রতাপ ইংরাজ কুঠিওয়ালার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হওয়া বাতুলতা, বোধ হয় এইরূপ চিন্তা করিয়াই শৈবলিনী ফষ্টরকে অবলম্বন করিয়া নিজের পাপ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার সুযোগ করিয়া লইল। শৈবলিনীর এই মানসিক অভিসন্ধি ২য় খঃ, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে স্বপ্নের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। 'প্রতাপ-রাজহংস'কে ধরিবার জন্যই যে শৈবলিনী 'ফষ্টর-শ্বেতশূকর'কে আশ্রয় করিয়াছিল তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ফষ্টরকে শৈবলিনী বরাবর ঘৃণা করিত। এই স্বপ্নেও সেই ঘৃণার ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে। ২য় খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদে শৈবলিনীর মনের কথা এইরূপঃ "মনে করিয়াছিলাম, গৃহের বাহির হইলেই প্রতাপকে দেখিব; মনে করিয়াছিলাম, আবার পুরন্দরপুরের কুঠিতে ফিরিয়া যাইব—প্রতাপের গৃহ এবং পুরন্দরপুর নিকট; কুঠীর

বাতায়নে বসিয়া কটাক্ষজাল পাতিয়া প্রতাপ-পক্ষীকে ধরিব, সুবিধা বুঝিলে সেখান হইতে ফিরিঙ্গীকে ফাঁকি দিয়া পলাইয়া যাইব, গিয়া প্রতাপের পদতলে লুটিয়া পড়িব"।

ফষ্টরের নিকট শৈবলিনী স্বীয় পবিত্রতা বরাবর রক্ষা করিয়াছিল। একথা শৈবলিনীর নিজ উক্তিতে প্রকাশ—'সাহেবের সঙ্গে আমার এ পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ হয় নাই। আমাকে গ্রহণ করিলে আমার স্বামী ধর্ম্মে পতিত হইবেন না।" (১ম খঃ। ৪র্থ পরিঃ) এবং "এই ছুরির ভয়ে দুরন্ত ইংরেজও বশ হইয়াছিল—সে বুঝিয়াছিল যে, সে আমার কামরায় প্রবেশ করিলে, এই ছুরিতে হয় সে মারিবে, নয় আমি মরিব।" (২য় খঃ। ৮ম পরিঃ)। পুনরায় ষষ্ঠ খণ্ডের সপ্তম পরিচ্ছেদে ফষ্টরের জবানবন্দীতেও এই কথা প্রকাশ পাইয়াছে—"আমি শৈবলিনীর রূপে মুগ্ধ হইয়া, তাহাকে গৃহ হইতে হরণ করিয়াছিলাম। আমার নৌকায় রাখিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম যে, সে আমার প্রতি আসক্ত। কিন্তু দেখিলাম যে, তাহা নহে; সে আমার শত্রু। নৌকায় প্রথম সাক্ষাতেই সে ছুরিকা নির্গত করিয়া আমাকে বলিল, 'তুমি যদি আমার কামরায় আসিবে, তবে এই ছুরিতে দুজনেই মরিব। আমি তোমার মাতৃতুল্য" শৈবলিনী ফষ্টরের সহিত ডাকাইতির রাত্রে বিনা আপত্তিতে পলাইয়া আসায় ফষ্টর ভাবিয়াছিল শৈবলিনী তাহার প্রতি আসক্ত। পূর্ব্বে তাহার সহিত সাহস করিয়া কথা কহায় ঐরূপ সিদ্ধান্ত করাই স্বাভাবিক। কিন্তু নৌকায় প্রথম সাক্ষাতেই তাহার সে ভ্রম দূরীভূত হইয়াছিল।

প্রতাপ শৈবলিনী

আশা-ভঙ্গ

প্রতাপ শৈবলিনীর বাল্য-প্রণয়ের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। প্রতাপ সম্বন্ধে গ্রন্থকার বহুক্ষণ নীরব থাকিয়া ২য় খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে তাঁহার কথা পুনরবতারণা করিয়াছেন। সুন্দরীর এক ভগিনী ছিল— নাম রূপসী। প্রতাপ এই রূপসীকে বিবাহ করিয়াছেন। চন্দ্রশেখরই এই বিবাহের ঘটক ছিলেন। তিনি "প্রতাপের চরিত্রে অত্যন্ত প্রীত" হইয়া তাঁহার বিবাহ ঘটাইয়াছিলেন এবং নবাবের সরকারে চাকরী করিয়া দিয়াছিলেন। প্রতাপ স্বীয় গুণে দিন দিন উন্নতিলাভ করিতেছিলেন. তিনি এখন জমিদার।

সুন্দরীর মুখে শৈবলিনী চন্দ্রশেখর সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার তিনি শুনিলেন। চন্দ্রশেখরের উপকারের কথা তিনি বিস্মৃত হন নাই। তিনি তাঁহার উপকারার্থ তখনই মুঙ্গের যাত্রা করিলেন। অপূর্ব্ব কৌশলে সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া তিনি শৈবলিনীকে ফষ্টরের কবল হইতে উদ্ধার করিলেন। শৈবলিনীর সাহত তাঁহার সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা ছিল না। ভৃত্যের অসাবধানতায় নিজগৃহে শৈবলিনীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটিল। নিজের নির্জ্জন শয়নকক্ষে পর্য্যঙ্কোপরি নিদ্রিতা শৈবলিনীর মনোমোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া

প্রতাপ বিমুগ্ধের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার দৃষ্টির মধ্যে মোহের লেশমাত্র ছিল না। গ্রন্থকার বলিতেছেন—"দেখিয়া প্রতাপ সহসা চক্ষু ফিরাইতে পারিলেন না। সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া বা ইন্দ্রিয় বশ্যতা প্রযুক্ত যে তাঁহার চক্ষু ফিরিল না, এমন নহে—কেবল অন্যমনস্ক বশতঃ তিনি বিমুগ্ধের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন।" (২য়ঃ খ। ৮ষ্ঠপরিঃ) কিন্তু হাজার হউক প্রতাপও মনুষ্য, তাই তাঁহার "স্মৃতিসাগর মথিত হইয়া তরঙ্গের উপর তরঙ্গ প্রহত হইতে লাগিল।" প্রতাপ নিঃশব্দে বহির্গত হইয়া যাইতেছিলেন; শৈবলিনীর সহিত আলাপ করিবার তাঁহার প্রবৃত্তি নাই। তাঁহার শয়নকক্ষেই শৈবলিনী আছে, একথা তাঁহার ভৃত্য তাঁহাকে বলিলে তিনি কদাচ এখানে আসিতেন না। তিনি পূর্ব্বেই ভৃত্যের উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন, কারণ তাঁহার গৃহে শৈবলিনীকে আনিবার জন্য তিনি আদেশ দেন নাই। যখন ভুলক্রমে তাহাকে তাঁহার গৃহেই আনা হইয়াছে, এবং যখন ভুলক্রমে শয়না শৈবলিনীর কক্ষে আসিয়া পড়িয়াছেন, তখন আর উপায় কি? তিনি বন্দুকটি দেওয়ালে ঠেস দিয়া রাখিয়া, বোধ হয়, বাহির হইয়া যাইতেছিলেন এমন সময় সেটি সশব্দে পড়িয়া গেল। শৈবলিনী চোখ চাহিতেই প্রতাপকে দেখিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। প্রতাপ তাহার সংজ্ঞা সঞ্চার করিয়াই যাইতে উদ্যত হইলে, শৈবলিনী বলিল, "যাইও না।" প্রতাপ কি করেন অনিচ্ছাপূর্ব্বক দাঁড়াইলেন।

শৈবলিনী কঠিন ভাবে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল "তুমি এখানে কেন? আমাকে এখানে কে আনিল? কেন তোমরা এখানে আনিলে? তোমাদের কি প্রয়োজন?" শেষ প্রশ্নে প্রতাপ রুষ্ট হইলেন। রুষ্ট হইবারই কথা। প্রতাপ ক্রুদ্ধভাবে উত্তর দিলেন,

"তোমার মত পাপিষ্ঠার মুখদর্শন করিতে নাই। তোমাকে ম্লেচ্ছের হাত হইতে উদ্ধার করিলাম—আবার তুমি জিজ্ঞাসা কর, এখানে কেন আনিলে?" (২য় খঃ। ৬ষ্ঠ পরিঃ)। শৈবলিনী প্রতাপের ক্রোধ দেখিয়া ক্রোধ করিল না। এখানে শৈবলিনী-চরিত্রের রহস্য অনুধাবনযোগ্য। প্রথমে শৈবলিনী বুঝিতে পারে নাই যে, প্রতাপ তাঁহার প্রতি অনুরক্ত নয়। প্রথম দর্শনে সে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছিল। পরে জ্ঞান সঞ্চার হইবার পর দু-এক কথা কহিয়া প্রতাপের সহানুভূতি লাভার্থ দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নীরব হইয়া রহিল। দেখিল প্রতাপ ফাঁদে পড়ে না—তাহাকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যায়। তখন স্ত্রীজন-সুলভ কৃত্রিম ক্রোধ দেখাইয়া উপর্য্যুক্ত কঠোর প্রশ্নগুলি করিয়াছিল। তাহার "হৃদয়মধ্যে অগ্নি জ্বলিতেছিল—তাঁহার নখ পর্য্যন্ত কাঁপিতে ছিল—সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়াছিল।" প্রতাপের রুষ্ট ভাব দেখিয়া পাপীয়সী বুঝিল, প্রতাপ সাধারণ মানুষ নয়। তাহার রূপরাশি ও ছলাকলা তাহার নিকট খাটিবে না। তখন নরম হইয়া আর একবার সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টা করিল। বাষ্পগদ্গদ হইয়া বলিল,—"যদি ম্লেচ্ছের ঘরে থাকা এত দুর্ভাগ্য মনে করিয়াছিলে—তবে আমাকে সেই স্থানে মারিয়া ফেলিলে না কেন?" এ মন্ত্রেও প্রতাপ ভুলিল না। তিনি অধিক ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "তাও করিতাম—কেবল স্ত্রীহত্যার ভয়ে করি নাই; কিন্তু তোমার মরণই ভাল।" এবার শৈবলিনী কাঁদিল। এ কান্না তাহার মায়া কান্না নয়। অতি আন্তরিক! যার জন্য চুরি করা যায়, সে-ই চোর অপবাদ দিলে তাহা অসহ্য হয়। শৈবলিনী বলিতে লাগিল, "আমার এ দুর্দ্দশা কাহা হ'তে?—তোমা হ'তে।" প্রতাপের জন্যই শৈবলিনীর আজ এই দুর্দ্দশা—ইহাই শৈবলিনীর

বিশ্বাস। লোভের সামগ্রী দেখিয়া লোভ হইলে, সে সামগ্রীর দোষ, না লোভীর দোষ, তাহা লোভী বিচার করিয়া দেখে না। পাপী নিজের পাপ-কর্ম্মের জন্য এইরূপেই নিজের সাফাই দিয়া থাকে। প্রতাপ নির্লিপ্ত; তাই সহজেই বুঝিতে পারিলেন ইহাতে তাহার বিন্দুমাত্র দোষ নাই। তিনি ত ইদানীং তাহাকে সর্প মনে করিয়া বেদগ্রাম ত্যাগ করিয়াছিলেন। যত দোষ শৈবলিনীর হৃদয়ের—তাহার প্রবৃত্তির। তাই তিনি বলিলেন, "তুমি পাপিষ্ঠা, তাই আমার দোষ দাও। আমি তোমার কি করিয়াছি?" এবার শৈবলিনীর ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। আর নিজেকে সংবরণ করিতে না পারিয়া গর্জ্জন করিয়া বলিতে লাগিল,—"কেন তুমি তোমার এই অতুল্য দেবমূর্ত্তি লইয়া আবার আমায় দেখা দিয়াছিলে? আমার স্ফুটনোন্মুখ যৌবনকালে, ও রূপের জ্যোতি কেন আমার সম্মুখে জ্বালিয়াছিলে?...তুমি কি জান না তোমারই রূপ ধ্যান করিতে করিতে আমার গৃহ অরণ্য হইয়াছিল? তুমি কি জান না যে, তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে, যদি কখনও তোমায় পাইতে পারি, এই আশায় গৃহত্যাগিনী হইয়াছি? নহিলে ফষ্টর আমার কে?" —বাস্তবিকই প্রতাপ এত কথা জানিতেন না। তাহা হইলে তিনি আজ শৈবলিনীকে এত কথা বলিতে পারিতেন না। সহসা একটা অন্ধকার প্রকোষ্ঠে দীপবর্ত্তিকা আনয়ন করিলে তাহা যেন মুহূর্ত্তে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, তেমনি সমস্ত রহস্য এক্ষণে প্রতাপের নিকট পরিষ্কার হইয়া গেল। তিনি "বৃশ্চিকদষ্টের ন্যায় পীড়িত হইয়া সে স্থান হইতে বেগে পলায়ন করিলেন।"

একদিন ফষ্টরের নৌকায় শৈবলিনী ফষ্টরের সমস্ত আশা যেরূপ নির্ম্মূল করিয়াছিল, আজ প্রতাপের গৃহে সেইরূপ তাহার সমস্ত আশা

নির্ম্মূল হইয়া গেল। আশা ভঙ্গে মনে অনুশোচনার উদয় স্বাভাবিক। তাই গ্রন্থকার ২য় খঃ। ৮ম পরিচ্ছেদে শৈবলিনীর অনুশোচনার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। শৈবলিনী প্রতাপকে না পাইয়া কিরূপ মনোকষ্ট পাইতেছিল এবং অহরহ মৃত্যু কামনা করিতেছিল তাহার আভাসও এইখানে পাওয়া যায়; কিন্তু সে সমস্ত কষ্ট সহ্য করিতেছিল একটি মাত্র আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া। "তখনও আমার আশা ছিল—আশা থাকিতে মানুষ মরিতে পারে না। কিন্তু আজ? আজ মরিবার দিন বটে।" দিন ত বটে, কিন্তু প্রতাপকে পাইবার আশা যাইয়াও যায় না। মনকে আঁখি ঠারিয়া যতই বুঝান যায় "প্রতাপ আমার কে? আমি তাহার চক্ষে পাপিষ্ঠা—সে আমার কে?" তবু মন বলে "কে তাহা জানি না। সে শৈবলিনী-পতঙ্গে জ্বলন্ত বহ্নি—সে এই সংসার-প্রান্তরে আমার পক্ষে নিদাঘের প্রথম বিদ্যুৎ—সে আমার মৃত্যু।"—সে তাহার-নিশ্চিত মৃত্যু জানিয়াও পতঙ্গবৎ পুনঃ পুনঃ কামনা বহ্নিতে উড়িয়া পড়িতে চায়, কোন বাধা মানে না। তাহার এই অনুশোচনাও ক্ষণস্থায়ী। তৃতীয় খণ্ডের ২য় পরিচ্ছেদে দেখিতে পাই শৈবলিনী প্রতাপকে বিপন্মুক্ত করিয়া পুনরায় তাহার সহানুভূতি লাভের চেষ্টা করিতেছে। সে কথা পরে বলিতেছি।

অনুশোচনা করিতে করিতে শৈবলিনীর পূর্ব্বস্মৃতি বড় মধুর ভাবে উদিত হইল। "বেদগ্রামের সেই গৃহ মনে পড়িল।" নানা চিন্তা করিয়া আত্মহত্যার চেষ্টা করিল; কিন্তু মরিতে পারিল না। সে মনে মনে পাপিষ্ঠা হইলেও কার্য্যতঃ এখনও কোন পাপ করে নাই। অথচ সকলে তাহাকে অসতী কুলত্যাগিনী বলিয়া জানে। এই কলঙ্কের বোঝা লইয়া সে মরিতে অনিচ্ছুক। সুন্দরীকে সে বলিতে চায়,

"আমার জাতি নাই, কুল নাই, কিন্তু এক পাপে আমি পাপিষ্ঠা নহি।" স্বামীর কথা মনে হইল। তখন সে শত সহস্র বৃশ্চিকের দংশন অনুভব করিল, তাহার শিরায় শিরায় আগুন জ্বলিল। তাঁহাকে কি বলিবে, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। তাঁহার উপর বড় অভিমান হইল, মনে ভাবিল "পুঁথিই তাঁহার সব। তিনি আমার জন্য দুঃখ করিবেন না।" হায়! শৈবলিনী চন্দ্রশেখরের সেই গভীর প্রেমের কথা জানিত না, যে প্রেমে তিনি জীবনাধিক প্রিয় পুঁথিগুলি ভস্মীভূত করিয়া গৃহধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া সন্ন্যাসী সাজিয়াছিলেন। শৈবলিনী কখনও তাঁহাকে ভালবাসিতে পারে নাই, ভাবিল, জীবনে কোনদিন ভালবাসিতে পারিবেও না। তবুও তাহার "নিতান্ত সাধ হয়, সেই কথাটি আমাকে কেহ আসিয়া বলে—তিনি কেমন আছেন, কি করিতেছেন।" স্বামী দুঃখ পাইলে তাহার পাপের-ভরা আরও ভারি হইবে, এ জ্ঞানটুকু তাহার আছে। এই ক্ষীণ পুণ্যালোকটুকু দেখিয়া আমাদের ভরসা হয়, শৈবলিনী পাপপঙ্ক হইতে উঠিলেও উঠিতে পারে। স্বামীকেও নিজের দৈহিক পবিত্রতার কথাটি জানাইতে তাহার বড়ই সাধ—"কিন্তু ফষ্টর মরিয়া গিয়াছে, সে কথার আর সাক্ষী কে?"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি শৈবলিনীর অনুশোচনা ক্ষণস্থায়ী। আশা মানুষকে পদে পদে প্রতারিত করিলেও মানুষ তাহাকে ছাড়িতে চাহে না। "কবিগণ আশার প্রশংসায় মুগ্ধ হন। আশা, সংসারের অনেক সুখের কারণ বটে, কিন্তু আশাই দুঃখের মূল। যত পাপ কৃত হয়, সকলই লাভের আশায়।" (৩য় খঃ। ২য় পরিঃ) যখন দলনীকে লইবার জন্য শিবিকা আসিল, তখন সেখানে শৈবলিনী ছাড়া আর কেহ ছিল না; কাজেই নবাবের অনুচরেরা দলনী-ভ্রমে তাহাকে কেল্লায় যাইতে

অনুরোধ করিল। "অকস্মাৎ তাহার মনে এক দুরভিসন্ধি উপস্থিত হইল।" নবাব যখন সেই লোক-বিমোহিনী সুন্দরীকে দেখিলেন, তখন তিনি মুগ্ধ হইলেন। সুযোগ বুঝিয়া শৈবলিনী প্রতাপকে বিপদের মুখ হইতে নিজে উদ্ধার করিবার সংকল্প করিল। নিজের পাপমুখে প্রতাপকে স্বামী বলিয়া নবাবের নিকট পরিচয় দিল। নবাব প্রতাপকে উদ্ধার করিতে অঙ্গীকার করিলেও সে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া নিজে তাঁহাকে উদ্ধার করিতে যাত্রা করিল। নবাবের সৈনিকদ্বারা প্রতাপ বিপন্মুক্ত হইলে শৈবলিনীর কোন লাভ নাই। সে চায়, নিজের জীবনকে বিপন্ন করিয়া তাঁহার উদ্ধার সাধন করিতে। তবুও যদি প্রতাপ-পাখী তাহার জালে ধরা পড়ে। প্রতাপ যে সিংহ শাবক, সে কথা পাপায়সী তখনও বুঝিতে পারে নাই। পাখী স্বেচ্ছায় ধরা না দিলে, শৈবলিনী তাহাকে জোর করিয়া রূপসীর নিকট হইতে কাড়িয়া লইবে, এ আকাঙ্ক্ষাও তাহার মনে ছিল। "হয়ত রূপসীর সঙ্গে স্বামী লইয়া দরবার করিবার জন্য তোমার কাছে আসিব।" (৩য় খঃ।৩য় পরিঃ)— মনে মনে নবাবকে সে এই কথা বলিয়া গিয়াছিল।

ইহার পর যে কৌশলে শৈবলিনী প্রতাপকে উদ্ধার করিল, তাহা পাঠ করিয়া মনে হয় কৌশলী প্রতাপ-সিংহের উপযুক্তা 'সিংহ-কামিনী' এই চতুরা শৈবলিনী। রূপসীর কোন পরিচয় আমরা না পাইলেও মনে মনে ধারণা জন্মে, রূপসী কেবল রূপসীই—কৌশলময়ী নহেন। প্রতাপ ও শৈবলিনী যখন জলমধ্যে সাঁতার দিতে ছিলেন, তখন "প্রতাপের আনন্দ-সাগর উছলিয়া উঠিতেছিল।" (৩য় খঃ। ৬ষ্ঠ পরিঃ) শৈবলিনী ভাবিতে ছিল, "এ জলের-ত তল আছে,—আমি যে অতল জলে ভাসিতেছি।" প্রতাপের আনন্দ হইয়াছিল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া—আর

শৈবলিনী কেবল নিজের দুরদৃষ্টের কথাই ভাবিতেছিল। তার অবস্থা অতল-জলে ভাসমান লোকের অবস্থার মতই ত বটে। যাহার জন্ম পাপের বোঝা মাথায় তুলিল, সে এখন মুখ তুলিয়া চায় না, একটা স্নেহের কথা কয় না। প্রতাপের হৃদয় আজ আনন্দে পূর্ণ হইয়াছিল বলিয়া, যেন কতকটা আত্মবিস্মৃত হইয়া ডাকিয়া ফেলিলেন—"শৈবলিনী—শৈ!"

বাল্যকালের এই প্রিয় সম্বোধন শুনিয়া শৈবলিনীর আনন্দের সীমা রহিল না। পুলকে তাহার চক্ষু মুদিয়া আসিল; সে মনে মনে চন্দ্র তারাকে সাক্ষী করিল। চক্ষু মুদিয়া বলিল, "প্রতাপ! আজি এ মরা গঙ্গায় চাঁদের আলো কেন?" প্রতাপ বলিলেন, "চাঁদের?—না। সূর্য্য উঠিয়াছে।"

দীর্ঘকাল শৈবলিনী প্রতাপের মুখের মিষ্ট কথা শুনে নাই। সেই দীর্ঘ সময় তাহার নিকট মন্বন্তর বলিয়া বোধ হইতেছিল। মন্বন্তরের পিপাসায় তাহার গঙ্গাসদৃশ প্রেমোদ্বেলিত হৃদয় শুষ্ক হইয়াছিল, তাই আজ প্রতাপ-"চন্দ্রে"র আদরের সম্বোধন শুনিয়া বলিল, "মরা গঙ্গায় চাঁদের আলো কেন?" প্রতাপের হৃদয়মধ্যে কোমল ভাবগুলি যেন ক্রমেই কঠিনতর হইয়া আসিতেছিল। পরের কথোপকথনে দেখা যায় প্রতাপ তাঁহার "পাপ" জীবনের ভার সহিতে পারিতেছিলেন না, বোঝা নামাইতে পারিলেই তিনি বাঁচেন। যদিও প্রতাপের "ঐশ্বর্য্য আছে—বল আছে—কীর্ত্তি আছে—বন্ধু আছে—ভরসা আছে—রূপসী আছে", তবু তিনি সুখী নহেন। চন্দ্রশেখরের মত হিতৈষীর প্রেয়সী তাঁহাতে অনুরাগিণী, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে? তিনি মনে করিয়াছিলেন আজি এই জীবন-সমস্যার একটা

মীমাংসা না করিয়া ছাড়িবেন না। তাই স্থির কণ্ঠে সংক্ষেপে বলিলেন, "চাঁদের ?—না। সূর্য্য উঠিয়াছে।" প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে আজি তিনি গঙ্গাসলিল নিঃশেষে শোষণ করিয়া ফেলিতে চান। যে চন্দ্রকিরণ শৈবলিনী-হৃদয়ে একদিন জোয়ার তুলিয়াছিল, তাহাই আজ প্রখর রবি-কিরণে পর্য্যবসিত হইয়া শৈবলিনীর "জীবন-নদীতে প্রথম বিপরীত তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত" করিল। (৩য় খঃ। ৬ষ্ঠ পরিঃ) শৈবলিনী সর্ব্ব সুখে জলাঞ্জলি দিয়া "প্রাণভয়ে সুখ-সৌন্দর্য্য-প্রণয়াদি পরিপূর্ণ সংসার হইতে পলাইল।"

চন্দ্রশেখর—শৈবলিনী

চিকিৎসা।

শৈবলিনীর ব্যাধি মানসিক। ভাল করিয়া জ্ঞানোন্মেষের পূর্ব্ব হইতে প্রতাপের প্রতি তাহার অনুরাগ জন্মিয়াছিল, এবং ভবিষ্যতে প্রতাপকেই জীবন-সঙ্গী রূপে পাইবে ভাবিয়া সযত্নে মনোমধ্যে সেই অনুরাগে ইন্ধন যোগাইতেছিল। বাল্যকালে একজনকে ভাল বাসিয়া তাহাকে না পাইলে নারীর জীবন অনেক সময় ব্যর্থ হয়। জগতের সকল জাতির মধ্যে এই সমস্যা অল্পাধিক দেখা যায়। তবে হিন্দু সমাজের সতীত্বের আদর্শ অন্য জাতির আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। এ সমাজে মনে মনেও কোন পুরুষকে পতিত্বে বরণ করিয়া অন্য পুরুষের সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইলে রমণীকে দ্বিচারিণী বলিয়া গণ্য হইতে হয়। বোধ হয় হিন্দু-সমাজ ভিন্ন অন্য কোথাও এত কঠোর শাসন দেখা যায় না। সেই জন্যই সমস্যাটি হিন্দুর পক্ষে আরও জটিল হইয়া পড়ে। যখন হিন্দু-বালিকার স্বয়ম্বরা হইবার অধিকার ছিল তখন সমস্যাটা এত জটিল হইত না। এখন অনেক ক্ষেত্রে বালিকার মতামত গ্রহণ না করিয়াই বিবাহ দেওয়া হয়। সুতরাং বালিকা কাহারও প্রতি অনুরাগিণী কিনা তাহা জানিবারও সুযোগ ঘটে না। হিন্দু বালিকাও অত্যন্ত লজ্জাশীলা বলিয়া তাহাদের মনের কথা অভিভাবকদিগকে জানাইতে পারে না।

নানাবিধ সামাজিক সমস্যা চিন্তাশীল লেখকদিগকে ভাবাইয়া তোলে। এই সমস্যাটিও আমাদের দেশের বড় বড় লেখকদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র এই সমস্যার একটা মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সমাজে যখন এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিতেছে,

তখন ইহার একটা মীমাংসা না করিলে চলে না। "যে যাকে পায়, সে তাকেই চায় না কেন? যাকে না পায়, তাকে চায় কেন?" (প্রথম খণ্ড। প্রথম পরিঃ) এই সমস্যা কেবল দলনীর মনেই উদিত হয় নাই অনেকের মনেই উদিত হইয়া থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র ইঙ্গিতে গ্রন্থারম্ভেই এই সমস্যার উল্লেখ করিয়া তাহার একটা মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছেন। অনেক আধুনিক লেখক সমস্যাগুলির উল্লেখমাত্র করিয়া, তাহার কুফল মাত্র দর্শাইয়া ক্ষান্ত হন। বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে সম্ভব সেখানে একটি সঙ্গত মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছেন।

শৈবলিনী যাহাকে পাইয়াছিল তাহাকে চায় না এবং যাহাকে চাহিয়াছিল তাহাকে পাইল না। এই না-পাইবার কারণ বিভিন্নক্ষেত্রে বিভিন্নরূপ হইয়া থাকে। শৈবলিনীর না-পাওয়ার কারণটি সামাজিক। প্রতাপ ছিল তাহার দূর জ্ঞাতি, অতএব সগোত্র। সগোত্রে বিবাহ হিন্দু-সমাজে নিষিদ্ধ। শরৎচন্দ্রের "দেবদাসে"র মধ্যে দেখা যায় পার্ব্বতী দেবদাসকে পাইল না এইরূপ অন্য একটি সামাজিক কারণে —বংশমর্য্যাদা সেক্ষেত্রে বাধা দিয়াছিল। ঈপ্সিত মিলনের অভাবে রমণীর অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইতে পারে "চন্দ্রশেখরে" বঙ্কিমচন্দ্র তাহাই দেখাইয়াছেন এবং তাহার একটা মীমাংসা করিয়াছেন। অন্যপক্ষে "দেবদাসে" শরৎচন্দ্র পুরুষের কি অধঃপতন ঘটিতে পারে তাহাই দেখাইয়াছেন। তিনি কোন মীমাংসার চেষ্টা করেন নাই, অন্য কোথাও কোন সমস্যার মীমাংসা তিনি করিয়াছেন বা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহাও মনে হয় না। তাঁহার পন্থা অন্যরূপ। তিনি সমস্যার পর সমস্যাগুলি জটিল হইতে জটিলতর করিয়া পাঠককে ভাবাইয়া তোলেন এবং সর্ব্ববিধ সংস্কারের সহিত মানবাত্মার সংঘর্ষের

কথাই বর্ণনা করেন। তাঁহার দৃষ্টিতে সংস্কার অপেক্ষা মুক্ত মানবাত্মা অনেক বড়। বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কারের বন্ধনকে অগ্রাহ্য করেন নাই। এই সংস্কার-বন্ধন না থাকিলে সমাজ-বন্ধন শিথিল হইয়া পড়ে, তাই তিনি মুক্ত মানবাত্মাকে যথেচ্ছভাবে বিহার করিতে দিতে চান না। হৃদয়ের—বিশেষতঃ নারী-হৃদয়ের প্রবণতা যে কিরূপ বেগবতী তাহা তিনি জানিতেন, তবুও তিনি চান এই প্রবণতাকে সংযমবন্ধনে বাঁধিয়া সমাজ-গ্রন্থিকে দৃঢ় রাখিতে। সেইজন্য শৈবলিনীর চিকিৎসার অপূর্ব্ব ব্যবস্থা তিনি করিয়াছেন।

আমাদের শাস্ত্রে পাপের যে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে তাহার মূলে একটি গভীর বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে। পাপের উদ্ভব হয়—মনে। সুতরাং সেই মনের চিকিৎসা না করিলে পাপ সমূলে বিনষ্ট হয় না। দৈহশক্তি প্রয়োগে তাহা ক্ষণিক প্রশমিত হইতে পারে সত্য, কিন্তু তাহাতে পাপের বীজ নষ্ট হয় না। আধুনিক Psycho-analysis-দ্বারা দুরারোগ্য ব্যাধিও নিরাকৃত হইতে পারে, একথা অনেক বৈজ্ঞানিক স্বীকার করিতেছেন। মনের উপর প্রয়শ্চিত্তেরও সেইরূপ একটা প্রভাব লক্ষিত হয়। শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তও তাহার মানসিক ব্যাধি নিরাময় করিবার জন্যই প্রযুক্ত হইয়াছিল।

দেহের সহিত মনের একটি অচ্ছেদ্য নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। সেইজন্য দৈহিক কৃচ্ছ্রসাধন প্রায়শ্চিত্তের একটি প্রধান অঙ্গ। শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত সেই দৈহিক দুঃখভোগেই আরম্ভ হইল। দুঃখের মধ্যে তাহার গার্হস্থ্য-সুখপূর্ণ বেদগ্রামে পতিগৃহ স্মরণ হইতেছিল। মনে হইতেছিল যে, "যদি আর একবার সে সুখাগার দেখিয়া মরিতে পারি, তবুও সুখে মরিব।" ভোগলালসায় জর্জ্জরিত হইয়া এখন পবিত্র মধুর

শান্ত পারিবারিক জীবনের আকাঙ্ক্ষা তাহার মনে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।

উপযুক্ত চিকিৎসক না হইলে রোগের সুচিকিৎসা হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রশেখরকেই চিকিৎসক নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। চরিত্রগুণে তিনি যে এই মানসিক ব্যাধির চিকিৎসায় সম্পূর্ণ উপযুক্ত, তাহা দেখা যাইবে।

চন্দ্রশেখর কেবল নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত নহেন, তিনি সংযমী এবং পরমহংস রমানন্দ স্বামীর প্রিয় শিষ্য। পরোপকার সাধন রমানন্দ স্বামীর জীবনের সর্ব্বপ্রধান ব্রত। তিনি সেই মন্ত্রে চন্দ্রশেখরকে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। দৈহিক ব্যাধির চিকিৎসার জন্য হৃদয়হীন বৈদ্য হইলেও চলে, কিন্তু মানসিক ব্যাধির চিকিৎসকের চরিত্রবল এবং রোগীর প্রতি সহানুভূতি থাকা একান্ত আবশ্যক। এ রোগের ঔষধ কৃচ্ছ্র সাধন, এবং আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের সহানুভূতি। সর্ব্বশেষে যোগবল বা Psychic force এর প্রয়োগও করা হইয়াছে।

কৃচ্ছ্র সাধন করিতে করিতে শৈবলিনীর "দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িল, মন ভাঙ্গিয়া পড়িল—শৈবলিনী অপহৃতচেতনা হইয়া অর্দ্ধনিদ্রাভিভূত, অর্দ্ধ-জাগ্রদবস্থায় রহিল।" এই অবস্থায় স্বপ্নে সে নরকের বীভৎস দৃশ্য দেখিতে লাগিল। মনুষ্য-কল্পনায় যাহা কিছু ভয়াবহ ঘৃণার্হ এবং বীভৎস হইতে পারে তাহা দিয়া কবিরা নরক দৃশ্য বর্ণনা করেন। মধ্যযুগের সাহিত্যে এই নরক বর্ণনার খুব প্রচলন ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র মিল্টন, ডান্টে ইত্যাদি কবিগণের এবং আমাদের পুরাণের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তাঁহার সমসাময়িক মধুসূদন, হেমচন্দ্র ইত্যাদি কবিগণের কাব্যেও এইরূপ নরক-বর্ণনা দেখা যায়। আধুনিককালে এইরূপ নরকচিত্র পাঠকের হাস্যোদ্রেক করে মাত্র, বিভীষিকা সৃষ্টি করে না।

নরকের ভয় পাপীর মনে তীব্র অনুশোচনার সৃষ্টি করে। শৈবলিনী নরক-ভয়ে ভীত হইয়া বলিয়া উঠিল "রক্ষা কর! এ নরক! এখান হইতে উদ্ধারের কি উপায় নাই?" চন্দ্রশেখর গুরুর উপদেশানুসারে শৈবলিনীর চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। নিজের গ্রামে দ্বাদশবর্ষ কৃচ্ছ্র-সাধনপূর্ব্বক স্বীয় পাপ কীর্ত্তন করিবার উপদেশ দিলেন। পরে দেখিতে পাই এই কঠোর ব্রত শৈবলিনীকে পালন করিতে হয় নাই। পতি-সন্দর্শনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা মনোমধ্যে উদিত হওয়ায় তাহাকে সপ্তাহ কাল অনন্যমনে পতির ধ্যান করিবার জন্য উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল। স্বামীর চিন্তা তাহার মনের উপর আশ্চর্য্য কাজ করিল। চিত্তবৃত্তি নিরোধকেই যোগ বলা হয়। শৈবলিনী যোগারূঢ়া হইয়া সর্ব্বত্র স্বামীকে দেখিতে লাগিল। অন্তরের অন্তরে তাহার দিব্য চক্ষু উন্মীলিত হইল। যে স্বামী এতদিন তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন নাই, এখন তাঁহার সুকুমার লাবণ্যময় সু-উন্নত পৌরুষব্যঞ্জক দেহখানি তাহার মনোহরণ করিল। তুলনায় প্রতাপ তাঁহার নিকট—সমুদ্রের পার্শ্বে গঙ্গার ন্যায় ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। সে নিজে-যে স্বামীর সম্পূর্ণ অযোগ্যা তাহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিল। তাহার চিত্তের অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ঘটিল। নিজের অতীত রুচিকে অসংখ্য ধিক্কার দিয়া নূতন জীবন আরম্ভ করিতে কৃতসঙ্কল্পা হইল। সে "প্রতাপকে ভুলিয়া চন্দ্রশেখরকে ভালবাসিল।"

এত অল্প প্রায়শ্চিত্তে তাহার পাপক্ষয় হইবার নহে। সেই জন্য চতুর্থ খণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদে কঠোর ব্রতপালনের পুনরুল্লেখ দেখিতে পাই। শৈবলিনী স্বামীর দর্শন লাভ করিয়া নিজের পাপ প্রবৃত্তির কথা তাঁহার নিকট আংশিক ভাবে স্বীকার করিল। চন্দ্রশেখর জানিত

শৈবলিনীকে ফষ্টর জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়াছিল। শৈবলিনী বলিল, "সে মিথ্যা কথা। আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক ফষ্টরের সঙ্গে চলিয়া আসিয়াছিলাম।" প্রতাপের জন্যই যে সে একাজ করিয়াছিল এবং তাহার পাপ যে মানসিকমাত্র সে কথার উত্থাপন সে করিল না। চন্দ্রশেখর সব কথা বুঝিলেন না। কেবল বলিলেন "শৈবলিনী! দ্বাদশ বৎসর প্রায়শ্চিত্ত কর। উভয়ে বাঁচিয়া থাকি, তবে প্রায়শ্চিত্তান্তে আবার সাক্ষাৎ হইবে। এক্ষণে এই পর্য্যন্ত।"

দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর প্রায়শ্চিত্তের পর যে সে বাঁচিয়া থাকিবে এরূপ আশা শৈবলিনীর ছিল না। আত্মহত্যা করিয়াও এই "মনোনরক" হইতে উদ্ধারের আশা তাহার নাই। জীবদ্দশাতেই তাহার নরকভোগ আরম্ভ হইয়াছিল। দিবারাত্র নরকদৃশ্য দেখিতে দেখিতে বিকট উন্মাদ আসিয়া তাহার সুবর্ণমন্দির অধিকার করিল। শৈবলিনীর শোচনীয় মনোবিকার লক্ষ্য করিয়া করুণায় চন্দ্রশেখরের কোমল হৃদয় বিগলিত হইল। চন্দ্রশেখর গদ্‌গদ্‌কণ্ঠে সকাতরে ডাকিলেন, "গুরুদেব, এ কি করিলে? এ কি করিলে?"

দয়াবতার রমানন্দ শৈবলিনীর প্রতি আর কোন কঠোর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিলেন না। তিনি চন্দ্রশেখরকে কাতর দেখিয়া বলিলেন "ভালই হইয়াছে। চিন্তা করিও না। তুমি এই খানে দুই একদিন বিশ্রাম কর। পরে ইঁহাকে সঙ্গে করিয়া স্বদেশে লইয়া যাও। যে গৃহে ইনি বাস করিতেন, সেই গৃহে ইঁহাকে রাখিও। যাঁহারা ইঁহার সঙ্গী ছিলেন তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা ইঁহার কাছে থাকিতে অনুরোধ করিও। প্রতাপকে সেখানে মধ্যে মধ্যে আসিতে বলিও। আমিও পশ্চাৎ যাইতেছি।"

এই সাহানুভূতি এখন বিকৃতমস্তিষ্কা শৈবলিনীর পরম ঔষধ। পাপী অনুতাপানলে দগ্ধ হইবার পর পবিত্রতা লাভ করে। স্বয়ং ঈশ্বর তাহাকে শ্রীচরণে আশ্রয় দেন। তাই অনুতাপদগ্ধা শৈবলিনী পতিপদে পুনরায় আশ্রয় পাইল।

বঙ্কিমচন্দ্রের তিনখানি পারিবারিক উপন্যাসের মধ্যে একটি ভাবের ক্রমবিকাশ লক্ষিত হয়। তাঁহার প্রথম পারিবারিক উপন্যাস "বিষবৃক্ষ"। এই বিষবৃক্ষের ফল অবৈধ প্রণয়। এই ফল ভক্ষণ করিয়া কুন্দনন্দিনী মরিয়াছিল, নগেন্দ্রনাথ মরিতে মরিতে বাঁচিয়া গিয়াছেন। "চন্দ্রশেখরে" দেখি এই ফলের আস্বাদমাত্র লইয়া শৈবলিনীকে মরণাধিক কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছে, প্রতাপ বিষফল না খাইয়াও তাহার সংসর্গে আসিয়া মরিয়াছেন। পরবর্ত্তী উপন্যাস "কৃষ্ণকান্তের উইলে" লেখকের মনে একটি সূক্ষ্মতর তত্ত্ব সমুদিত হইয়াছে। বিষফল খাইয়া রোহিনী ত মরিল-ই, গোবিন্দলাল (প্রথম সংস্করণে) মরিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমরকে মারিয়া গেল। দাম্পত্য প্রণয়ের আদর্শ যে কত উচ্চ, কত পবিত্র তাহাই তিনি এই শেষ উপন্যাসে দেখাইয়াছেন। সেই জন্যই তিনি ভ্রমরের সহিত গোবিন্দলালের পুনর্মিলন ঘটান নাই। দাম্পত্যধর্ম্মচ্যুত গোবিন্দলালকে যথাবিহিত প্রায়শ্চিত্ত করাইয়াছেন। ইহা অবশ্য চরমপন্থীর কথা। কিন্তু পবিত্রতার আদর্শ মানিয়া লইলে ধর্ম্ম-লঙ্ঘনে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা না করিয়া উপায় নাই। একদিকে সমাজবন্ধন দৃঢ় রাখিবার জন্য এবং অপরদিকে পাপীর মানসিক পরিবর্তন সাধন করিয়া পাপের অঙ্কুর পর্য্যন্ত বিনষ্ট করিবার জন্য এই প্রায়শ্চিত্তের ক্ষমতা অসীম।

অবশেষে যোগবলের সাহায্যে বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনীর মনোবিকার সম্পূর্ণভাবে আরোগ্য করিয়াছেন, এবং তৎসঙ্গে চন্দ্রশেখরের নিকট

শৈবলিনীর মনের পাপ ও শারীরিক পবিত্রতার কথা ব্যক্ত করাইয়াছেন। গ্রন্থশেষে দেখিতে পাই শৈবলিনী পবিত্রতা ফিরিয়া পাইলেও নিজের উপর তাহার বিশ্বাস নাই—সে প্রতাপকে বলিতেছে—"স্ত্রীলোকের চিত্ত অতি অসার, কত দিন বশে থাকিবে, জানি না। এ জন্মে তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও না।"

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্র এখানে স্ত্রীলোকের প্রতি একটু অবিচার করিয়াছেন। শুধু স্ত্রীলোক কেন, পুরুষের চিত্তও অনুরূপ ক্ষেত্রে স্ববশে থাকে না। প্রতাপকে স্বার্থ-ত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাই-বার জন্যই কি বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনীকে ঐ কথা বলাইয়াছেন? সর্ব্বশেষে দেখিতে পাই, প্রতাপ মনে প্রাণে শৈবলিনীকে আজীবন ভালবাসিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু দৈহিক মিলন আকাঙ্ক্ষা করেন নাই। দৈহিক মিলন আকাঙ্ক্ষা না করিয়াও ভালবাসা সমাজধর্ম্মের এবং দাম্পত্যধর্ম্মের বিরোধী। তাই শৈবলিনীকে বলাইয়াছেন—"পূর্ব্বকথা সকল তাঁহাকে (চন্দ্রশেখরকে) বলিয়া ক্ষমা চাহিব।" "মনের পাপ আবার লুকাইয়া রাখিয়া, তাঁহার প্রণয়ভাগিনী হওয়া কি উচিত হয়?"

প্রণয় বিষয়ে স্ত্রীপুরুষের অধিকার সর্ব্বত্র সমান হইলেও এই একটি ক্ষেত্রে যেন একটু পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য বাস্তবিক থাকা উচিত কিনা সে সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র নিঃসংশয় হইতে পারেন নাই। প্রতাপ রমানন্দ স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন "এ জন্মে এ অনুরাগে মঙ্গল নাই বলিয়া এ দেহ পরিত্যাগ করিলাম।............আমি কি জগদীশ্বরের কাছে দোষী? যদি দোষ হইয়া থাকে, এ প্রায়শ্চিত্তে কি তাহার মোচন হইবে না? উত্তরে রমানন্দ স্বামী বলিতেছেন—"তাহা জানি না। মানুষের জ্ঞান এখানে অসমর্থ; শাস্ত্র এখানে মূক। তুমি যে

লোকে যাইতেছ সেই লোকেশ্বর ভিন্ন একথার কেহ উত্তর দিতে পারিবেন না।"

দাম্পত্য আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য প্রতাপকে সংসার হইতে অপসৃত করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এ ক্ষেত্রে প্রতাপ শৈবলিনী উভয়েরই দোষ ছিল। শৈবলিনীর দোষ গুরুতর, কারণ সে দৈহিক মিলন কামনা করিত, সেই জন্যই তাহার প্রায়শ্চিত্ত কঠোর। প্রতাপের "ভালবাসার নাম—জীবন বিসর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা।" কিন্তু এই আকাঙ্ক্ষাও ইহলোকে মঙ্গলজনক নয়, প্রতাপের মুখে সে কথাও বলাইয়াছেন এবং সেই জন্যই তাঁহাকে মৃত্যুর করালগ্রাসে নিক্ষেপ করিয়া দাম্পত্যধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। সুচিকিৎসকের মত বঙ্কিমচন্দ্র ব্যাধির প্রতিকারের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছেন।

সুন্দরী

"চন্দ্রশেখর" আখ্যায়িকা সম্বন্ধে সব কথাই স্থূলভাবে বলা হইল। এক্ষণে এই উপন্যাসের একটি অপ্রধান চরিত্রের সম্বন্ধে দুই চারি কথা না বলিলে তাহার প্রতি অবিচার করা হইবে। গ্রন্থখানি পাঠ করিবার সময় "সুন্দরী"র প্রতি আমাদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা জন্মে। এই সুন্দরীর কথাই এখন আমরা কিছু আলোচনা করিব। "সে চন্দ্রশেখরের প্রতিবাসিনীর কন্যা, সম্বন্ধে তাঁহার ভগিনী।" সুন্দরী খাঁটি বাঙ্গালী বধূ। এই চরিত্রে কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিক 'রোমান্স্' লক্ষিত হইলেও তাহার চরিত্রের মূল উপাদানগুলি সাধারণ বাঙ্গালী বধূর মধ্যেই দেখা যায়। সে শৈবলিনীকে কিরূপ আন্তরিক স্নেহ করিত তাহার প্রমাণ তাহার প্রত্যেক কথায়-বার্ত্তায় ও কার্য্যে পাওয়া যায়।

প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদেই আমরা শৈবলিনীর এই পরম হিতাকাঙ্ক্ষিণী সখীটির সাক্ষাৎলাভ করি। সামান্য দুই চারিটি কথায় এখানে বঙ্কিমচন্দ্র এই স্নেহপ্রবণা রমণীটির হৃদয়ের সম্যক্ পরিচয় দিয়াছেন। শৈবলিনী যখন ভীমা পুষ্করিণীতে অপরাহ্নে জল আনিতে গিয়া দেরি করিতেছিল, তখন সুন্দরী বলিল, "ভাই, সন্ধ্যা হইল, আর এখানে না। চল বাড়ী যাই।",

শৈ। কেহ নাই, ভাই, চুপি চুপি একটি গান গা না।

সু। দূর হ! পাপ! ঘরে চ!

এই কয়েকটি কথাতেই সুন্দরীর অন্তরটি অতি স্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। সুন্দরী শৈবলিনীকে প্রাণের সহিত ভালবাসে। সে যে

'গোরা' দেখিয়া শৈবলিনীকে ফেলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইয়াছিল তাহার কারণ শৈবলিনীর প্রতি তাহার স্নেহের অভাব নহে। বাঙ্গালী রমণী তখনকার দিনে গোরা দেখিয়া কিরূপ ভয় পাইত, এখানে গ্রন্থকার তাহাই দেখাইয়াছেন।

এই পরিচয়ের পরে আমরা আবার ফষ্টর কর্ত্তৃক শৈবলিনী-হরণের পর সুন্দরীর সাক্ষাৎ লাভ করি। চন্দ্রশেখরের গৃহে ডাকাতির সংবাদ পাইয়া প্রতিবেশীদিগের অনেকেই ঔৎসুক্য চরিতার্থ করিতে ও মৌখিক সহানুভূতি দেখাইতে আসিয়াছিল। সুন্দরীও আসিয়াছিল, কিন্তু সে যে অন্যান্য জনসাধারণ হইতে স্বতন্ত্র, তাহা বঙ্কিমচন্দ্র দুই একটি কথায় ব্যক্ত করিয়াছেন; "সুন্দরী নামে যে যুবতীকে আমরা প্রথম পরিচিতা করিয়াছি, সেই সকলের শেষে উঠিয়া গেল।" "সে গৃহে গিয়া কাঁদিতে লাগিল।"

ইহার পর নাপিতানী বেশে তাহাকে শৈবলিনীর উদ্ধারের জন্য যত্নশীলা দেখিতে পাই। বাঙ্গালীর ঘরে এরূপ "রোমান্স্" কচিৎ দৃষ্ট হইলেও বঙ্কিমচন্দ্র অপূর্ব্ব সাহসের সহিত এইরূপ বহু রোমান্সের অবতারণা করিয়াছেন। ইহা যে বঙ্কিমের উপর পাশ্চাত্য প্রভাবের একটি দৃষ্টান্ত তাহাতে সন্দেহ নাই। বাঙ্গালীর বৈচিত্র্যহীন অল্পপরিসর জীবন লইয়া উৎকৃষ্ট উপন্যাস রচনা করা একপ্রকার অসম্ভব। সেই জন্যই রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রকে আমরা পদে পদে আলোকপ্রাপ্ত ব্রাহ্মপরিবার ও পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হিন্দু পরিবারের ভিতর তাঁহাদের উপন্যাসের পরিকল্পনা সমাবেশ করিতে দেখিতে পাই। বঙ্কিমচন্দ্র তাহা না করিয়া আরো অধিকতর সাহসের সহিত হিন্দু ও মুশলমান পরিবারের মধ্যেই তাহার উপাদান অনুসন্ধান করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার এমনি কলাকৌশল যে পাঠ

করিবার সময় পাঠক নিবিষ্টচিত্তে অগ্রসর হইতে থাকেন, এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া ইহা স্বাভাবিক কি অস্বাভাবিক তাহা প্রশ্ন করিবার অবসর পান না।

সুন্দরী নাপিতানী বেশে অতি চতুরতার সহিত শৈবলিনীর নৌকায় উপস্থিত হইল। শৈবলিনীর পদযুগল অলক্তক রঞ্জিত করিতে করিতে অবগুণ্ঠনবতী সুন্দরী কাঁদিতে লাগিল। শৈবলিনী তাহাকে চিনিতে পারিলে পর সুন্দরী একটু হাসিল এবং তাহার সহিত বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া শৈবলিনীকে নিজ স্বামীর নৌকায় গিয়া উঠিতে বলিল। যখন শৈবলিনী সুন্দরীর দশার কথা চিন্তা করিয়া শিহরিয়া উঠিল, তখন সুন্দরী যাহা বলিল, তাহা প্রাচীন ব্রাহ্মণ-কন্যারই উপযুক্ত "বাঙ্গালায় এমন ইংরেজ আসে নাই যে, সুন্দরী বামনীকে নৌকায় পুরিয়া রাখিতে পারে। ………মন দৃঢ় থাকিলে পৃথিবীতে আমাদের বিপদ নাই।……… বিপত্তিভঞ্জন মধুসূদন আমার ভরসা।"

যখন স্বামী গ্রহণ করিবেন না, এই ভয়ে শৈবলিনী ফিরিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল, তখন সতীত্ব তেজোদৃপ্তা সুন্দরী বলিতেছে "সত্য কথা বল্‌বি?" শৈবলিনী ইঙ্গিত পাইবামাত্র জানাইল, সে এখনও সম্পূর্ণভাবে নিষ্কলঙ্কা। সুন্দরী ভরসা দিল যে, তাহার ধর্ম্মাত্মা স্বামী তাঁহার নিষ্কলঙ্কা পত্নীকে নিশ্চয় গ্রহণ করিবেন। এখানে সতীত্বের উপর সুন্দরীর পূর্ণ বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। পুনরায় শৈবলিনী বলিল যে, কোন সুখের আশায় সে স্বগ্রামে গিয়া আজীবন কলঙ্কভার বহন করিবে। ''ন পিতা, ন মাতা, ন বন্ধু—''। ইহার উত্তরে সুন্দরী বলিল,—''কেন, স্বামী? এ নারীজন্ম কাহার জন্য?" চন্দ্রশেখরকে স্বামিরূপে পাইয়া শৈবলিনী সুখী হয় নাই, যখন সেই কথার উল্লেখ করিয়া শৈবলিনী

বলিল, "সব ত জান—" তখন বাধা দিয়া সুন্দরী তাহাকে অত্যন্ত কটূক্তি করিল। চন্দ্রশেখরের মত স্বামী পাইয়া সে যে তাঁহার মর্য্যাদা বুঝিলে না, ইহাতে তাহার গভীর দুঃখ হইল। নারীর সতীত্বই একমাত্র অপার্থিব ধন। সেই সতীত্ব গৌরব হইতে যে স্খলিত হইতে পারে সে প্রাণাপেক্ষা প্রিয় হইলেও সুন্দরী তাহাকে ক্ষমা করিতে পারে না। অতি কঠোর ভাবে সে তখন শৈবলিনীকে গালি পাড়িতে পাড়িতে ফিরিয়া গেল। এই গালির ভিতর দিয়াই আমরা সুন্দরী চরিত্রের সম্পূর্ণ মাধুর্য্যটুকু উপভোগ করিতে পারি। "ভরসা করি, তুমি শীঘ্র মরিবে। দেবতার কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, যেন মরিতে তোমার সাহস হয়। মুঙ্গেরে যাইবার পূর্ব্বেই যেন তোমার মৃত্যু হয়।" অতি আপনার জন ভিন্ন অপর কাহাকেও এরূপভাবে গালি দেওয়া যায় না। শৈবলিনী সুন্দরীর যে কত আপনার জন আমরা এইখানেই তাহার সম্যক্ পরিচয় পাই।

সুন্দরী শৈবলিনীকে গালি পাড়িতে পাড়িতে ফিরিয়া গেল বটে, কিন্তু সে পাপিষ্ঠাকে পাপের পথে অবাধে ছাড়িয়া দিতে অনিচ্ছুক। তাই তাহাকে আমরা অনতিবিলম্বে তাহার ভগিনীপতি প্রতাপের সহিত মিলিত হইতে দেখিতে পাই। সুন্দরী ভগিনীপতির নিকট চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীর নির্ব্বাসন-বৃত্তান্ত সবিস্তারে বিবৃত করিল। প্রতাপ যখন বলিলেন যে, চন্দ্রশেখর তাহার পরমহিতৈষী, বহুপূর্ব্বে তাঁহার নিকট সংবাদ পাঠান সুন্দরীর উচিত ছিল, তখন সুন্দরী প্রতাপকে উত্তেজিত করিবার জন্য বলিল, "কিন্তু শুনিয়াছি, লোকে বড়মানুষ হইলে পূর্ব্বকথা ভুলিয়া যায়।" ইহা শুনিয়া প্রতাপ ক্রুদ্ধ হইলেন দেখিয়া সুন্দরী পরম আহ্লাদিত হইল। তাহার ঔষধে ফল ফলিল। প্রতাপ প্রতিজ্ঞা

করিলেন, "আমি চন্দ্রশেখর-শৈবলিনীর সন্ধান করিতে চলিলাম; সন্ধান না করিয়া ফিরিব না।" (২য় খঃ। ৪র্থ পরিঃ)।

সুন্দরীর প্রণয় অকৃত্রিম। তাই সে বন্ধুকে পাপের কবলে নিক্ষেপ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না। সে ভগিনী রূপসীর নিকট তাহাকে প্রাণ ভরিয়া দিবারাত্র গালি দিতে লাগিল। রূপসী তাহার গালি শুনিয়া একদিন বলিল, "দিদি, তুই বড় কুঁদুলী।"

সুন্দরী উত্তর করিল, "সেই ত আমায় কুঁদুলী করেছে।"

এই কথা কয়টির মধ্যে কি অপূর্ব্ব রস নিহিত রহিয়াছে !! শৈবলিনীর বিরহে—ততোধিক তাহার অধঃপতনে সুন্দরীর প্রাণে কি যে অসহ্য মর্ম্মান্তিক জ্বালা পুঞ্জীভূত হইয়াছে, তাহারই একটি স্ফুলিঙ্গ যেন সহসা বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

গ্রন্থের শেষের দিকে আমরা পুনরায় এই স্নেহশীলা রমণীর দর্শনলাভ করি। তখন শৈবলিনী ক্ষিপ্তাবস্থায় স্বামী-কর্ত্তৃক বেদগ্রামে আনীত হইয়াছে। সুন্দরী শৈবলিনীকে প্রাণাপেক্ষা স্নেহ করিলেও ব্রাহ্মণ-কন্যার স্বাভাবিক শুচিতা সম্বন্ধে সে পূর্ণভাবে সজাগ। বঙ্কিমচন্দ্র অতি সংক্ষেপে তাহার ইঙ্গিত দিয়াছেন। "একটু তফাৎ রহিল, কাপড়ে কাপড়ে না ঠেকে।" কিন্তু সে যখন শুনিল, শৈবলিনী পাগল হইয়া গিয়াছে, তখন তাহার সর্ব্বপ্রকার সংস্কারের বাধা মুহূর্ত্তে অপসৃত হইয়া গেল। সে শৈবলিনীর জন্য অবিরল অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। বঙ্কিমচন্দ্র এই রমণীরত্নকে উপলক্ষ্য করিয়া স্ত্রীজাতির গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন। "স্ত্রীজাতিই সংসারের রত্ন! এই সুন্দরী আর একদিন কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিয়াছিল, শৈবলিনী যেন নৌকা সহিত জলমগ্ন হইয়া মরে। আজি সুন্দরীর ন্যায় শৈবলিনীর জন্য কেহ কাতর নহে।"

সত্যই 'সুন্দরী' রমণীরত্ন। বাঙ্গালী সমাজের অশিক্ষিতা, সহস্র সংস্কার-বিজড়িতা রমণীর মধ্যে স্নেহের কি প্রবল অন্তঃসলিলা প্রবাহিত, বঙ্কিমচন্দ্র সুন্দরীচরিত্রে তাহাই দেখাইয়াছেন।

পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন

চন্দ্রশেখর বঙ্গদর্শনে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল, একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার সময় নূতন কলেবর ধারণ করিয়াছিল। প্রথম সংস্করণের কতক অংশ আবার পরবর্ত্তী সংস্করণে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। নিম্নে প্রধান প্রধান পরিবর্ত্তনগুলির উল্লেখ করা গেল।

প্রথম সংস্করণে দ্বিতীয় খণ্ডে "ভ্রাতার স্নেহ" বলিয়া একটা পরিচ্ছেদ ছিল। পরবর্ত্তী সংস্করণে তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দেখিতে পাই, গুরগন্ একজন শস্ত্রবাহক দ্বারা আজ্ঞা পাঠাইলেন, দলনীকে প্রহরীরা যেন দুর্গে প্রবেশ করিতে না দেয়। "ভ্রাতার স্নেহ" নামক পরিচ্ছেদে দলনীর দুর্গ-প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা গুরগন্ স্বয়ং প্রহরীকে দিয়া আসিল। দুর্গদ্বার হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে পথিমধ্যে গুরগন্ দলনী ও কুল্‌সমকে দেখেন এবং দলনীকে স্বয়ং নিষেধাজ্ঞার কথা জানান।

তৃতীয় খণ্ডে প্রতাপ ও শৈবলিনীর অগাধ জলে সাঁতার দিবার সময় প্রতাপ শৈবলিনীকে শপথ করাইয়াছিলেন। প্রথম সংস্করণে শপথের কথাগুলি ছিল, পরে তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। শপথের কথা এইরূপ ছিল:—"শপথ কর, যে এজন্মে আমি তোমার ভ্রাতা—তুমি আমার ভগিনী। তুমি আমার কন্যাতুল্যা—আমি তোমার পিতৃতুল্য—তোমার সঙ্গে আমার অন্য সম্বন্ধ নাই। এ জন্মে তুমি আমাকে অন্য চক্ষে দেখিবে না—অন্য চক্ষে ভাবিবে না। শপথ কর।" প্রথম সংস্করণের

এই শপথের আভাসমাত্র পরবর্ত্তী সংস্করণে প্রদত্ত হইয়াছে, "প্রতাপ অতি ভয়ানক শপথের কথা বলিল।" (৩য় খণ্ড। ৬ষ্ঠ পরিঃ)

এতদ্ব্যতীত প্রথম সংস্করণে একটি পরিশিষ্ট ছিল। যে চরিত্রগুলির পরিণাম পূর্ব্বে দেখান হয় নাই, পরিশিষ্টে সেগুলির কথা উল্লিখিত হইয়াছিল। ষষ্ঠ খণ্ডে সপ্তম পরিচ্ছেদের শেষে লিখিত আছে "কুল্‌সম্‌, চন্দ্রশেখর, শৈবলিনী ও ফষ্টর ইহারাও বাহির হইল।" অতঃপর লরেন্স ফষ্টরের কোন কথা বর্ত্তমান সংস্করণে নাই। কেবল দেখিতে পাই প্রতাপ বলিতেছেন, "ফষ্টর এখনও জীবিত আছে তাহার বধে চলিলাম।" (৬ষ্ঠ খঃ। ৮ম পরিঃ)।

পরিশিষ্টে ছিল, লরেন্স ফষ্টর ইংরাজ কর্তৃক পলাতক রাজ বিদ্রোহী বলিয়া ধৃত হইয়াছিল এবং ঐ অপরাধে তাহার ফাঁসি হইয়াছিল। চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে লইয়া গৃহে আসিলেন। তিনি জানিলেন শৈবলিনী রোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে। তিনি সেই দিনই পুনর্ব্বার সংসার পাতিয়া শৈবলিনীকে গ্রহণ করিলেন। রমানন্দ স্বামী আসিলে একটা লৌকিক প্রায়শ্চিত্ত করিবেন স্থির করিলেন।

"রমানন্দ স্বামী প্রতাপের মৃত্যু-সংবাদ লইয়া আসিলেন। কেন প্রতাপ মরিয়াছে, তাহা প্রকাশ করিলেন না। চন্দ্রশেখর কিয়দ্দিবস প্রতাপের শোকে এত অধীর হইয়া রহিলেন যে শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তের কথা বিস্মৃত হইয়া রহিলেন। রমানন্দ স্বামী প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আশ্রমে যাত্রা করিলেন।"

নবাব কাসেমআলী খাঁ মুঙ্গেরে পলাইলেন। তথায় জগৎশেঠদিগকে গঙ্গাজলে নিমগ্ন করিয়া বধ করিলেন। তাঁহার আদেশে গুরগন্‌ খাঁও নিহত হইল। অতঃপর তিনি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া ফকিরি গ্রহণ করেন।

কুল্সম্ মীরজাফরের অবরোধে নিযুক্ত হইল। সে দলনীকে কখনও ভুলিল না।

(এই অংশ শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কৃত "বঙ্কিম-জীবনী" হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে)

বঙ্কিমচন্দ্রের উপর পাশ্চাত্য প্রভাব

যাহা আমরা উপন্যাস বলিতে বুঝি তাহা ভারতবর্ষে খুব বেশী দিনের জিনিষ নয়। সংস্কৃত সাহিত্যে অবশ্য 'কাদম্বরী' 'স্বপ্নবাসবদত্তা' প্রভৃতি গদ্য আখ্যান দেখিতে পাই। কিন্তু এগুলিকে আধুনিক মাপকাটিতে ঠিক উপন্যাস বলা চলে না। ইহা একপ্রকার গদ্যকাব্য। ভাষার নানা ভঙ্গি ও অলঙ্কারের বিচিত্র বিন্যাস হইতে ভাবময় কল্পলোকে আমাদের কথাসাহিত্যের যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে ইংরাজ অধিকারের পর হইতে। পাশ্চাত্য সাহিত্যের Romanticism বঙ্গসাহিত্যে প্রথম দেখা গেল বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে। বঙ্কিমের 'দুর্গেশ-নন্দিনী' ও 'কপালকুণ্ডলা' দূরের রহস্যময় মায়াপুরীর সন্ধান আমাদের বাস্তব-জগতে আনিয়া দিয়াছিল। যে উপায়ে তিনি এই কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন তাহা যে সাগরপারের আমদানী একথা স্বীকার করিতে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র কুণ্ঠিত ছিলেন না, আমাদেরও কুণ্ঠিত হইবার কোন কারণ নাই।

সংস্কৃত সাহিত্যে কল্পনার অভাব নাই। যাহাকে আমরা Romance বলি সংস্কৃত বহু কাব্যেই তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাই। কিন্তু তাহা হইলেও বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সমূহের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময় আবেষ্টনের উপর পাশ্চাত্য ঔপন্যাসিকগণের বিশিষ্ট প্রভাব বর্ত্তমান। সংস্কৃত কবিগণের নিকটও তাঁহার ঋণ কম নহে; কিন্তু এই প্রভাবের সহিত পাশ্চাত্য প্রভাবের বেশ একটা সামঞ্জস্য হইয়াছে বলিয়াই তাঁহার রচনায় এত অভিনব সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য!

শুধু সাধারণ আবেষ্টন নহে, চরিত্র পরিকল্পনা এবং কথাবস্তুর সন্নিবেশেও তাঁহার উপর পাশ্চাত্যের প্রভাব বেশ পরিস্ফুট ভাবে দৃষ্ট হয়।

কথাবস্তুর সন্নিবেশে মূল বিষয়ের সহিত অন্য আর একটি বিষয় গ্রথিত করিবার পদ্ধতি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার পশ্চিম দেশীয় সাহিত্যাচার্য্যগণের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ আমরা 'চন্দ্রশেখরে'র মূল বিষয় অর্থাৎ প্রতাপ-শৈবলিনীর আখ্যায়িকা ও তৎসহ গ্রথিত দলনী-মীরকাসেমের কাহিনীর কথা স্মরণ করিতে পারি। এইরূপ কথাবস্তুকে ইংরাজীতে Complex plot বলে এবং Scott প্রভৃতি ঔপন্যাসিকগণের গ্রন্থে এইরূপ পরিকল্পনাই সচরাচর দৃষ্ট হয়। চরিত্র পরিকল্পনাতেও পাশ্চাত্য প্রভাবের আভাস পাওয়া যায়। উপন্যাস-গঠিত চরিত্রের ভিতর দিয়া কোন বিশেষ সিদ্ধান্ত প্রতিপাদিত করা অথবা মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করা ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্যের রীত্যনুমোদিত নহে। প্রাচীন সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য ছিল রস সৃষ্টি করা। কাব্যকে প্রাচীন সাহিত্যিকগণ রসাত্মক বাক্যরূপেই অভিহিত করিয়াছেন। রস অথবা বিশুদ্ধ আনন্দ দান করাই সে সাহিত্যের মূল লক্ষ্য ছিল। আধুনিক সাহিত্য এ বিষয়ে কতকটা ভিন্ন প্রকৃতির। বর্ত্তমান সাহিত্য সৃষ্টির আদর্শ শুধু সহজ আনন্দ দান নহে, সমস্যা সমাধান ও বর্ত্তমান সাহিত্যের একটা অন্যতম লক্ষ্য। এরূপ লক্ষ্য থাকা উচিত কিনা এ সম্বন্ধে অবশ্য নানা মতভেদ দৃষ্ট হয়। তথাপি ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে আধুনিক মনীষিগণের কাব্য-নাটক-উপন্যাসের মধ্য দিয়া নানা সমস্যা-সমাধানের চেষ্টা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। বাংলা উপন্যাসে প্রথম এই ধারা বঙ্কিমচন্দ্রই প্রবর্ত্তন করেন এবং ইহার প্রেরণা তিনি পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতেই পাইয়াছিলেন। 'চন্দ্রশেখরে' তিনি যে সমস্যা-সমাধানের চেষ্টা করিয়াছেন তাহার বিষয় আমরা পূর্ব্বে সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছি। ইহাতে তিনি যে মনস্তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন এবং নরকাদির যে

মানসিক বিভীষিকাময় চিত্র দেখাইয়াছেন, তাহার উপর পাশ্চাত্য সাহিত্য এবং দার্শনিক মতবাদের ছায়াপাত হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক স্ত্রীচরিত্র ঠিক যেন ভারতীয় ও পাশ্চাত্য ভাবের সংমিশ্রণে কল্পিত! 'চন্দ্রশেখরে'র শৈবলিনী ও সুন্দরী এবং 'আনন্দমঠে'র শান্তির চরিত্রের ভিতর যে প্রগল্‌ভতা ও দুঃসাহসিকতা দৃষ্ট হয়, তাহার সহিত 'শেক্ষপীয়ার রচিত ইমোজেন্‌, ভায়লা, হেলেন প্রভৃতি চরিত্রের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ চরিত্রের পরিকল্পনা তিনি পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতেই পাইয়াছিলেন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

কিন্তু এই পাশ্চাত্য প্রভাব তাঁহার মনের বহিঃপ্রদেশেই আবদ্ধ ছিল। ইহা তাঁহার ধর্ম্ম বা নৈতিক বিশ্বাসের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। তাঁহার উপন্যাস রচনার পদ্ধতির (technique) জন্য তিনি পাশ্চাত্য সাহিত্যের নিকট ঋণী হইলেও তাঁহার ভাব-জগতে তিনি প্রায় সম্পূর্ণরূপেই ভারতীয় বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। উপন্যাসে তিনি সমস্যা-সমাধানের চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সে সমাধান ভারতীয় আদর্শবাদেরই উপর প্রতিষ্ঠিত। অত্যাধুনিক সাহিত্যিকগণের ন্যায় তিনি পাশ্চাত্য সমাজের জঞ্জালরাশির আমদানী করিয়া স্বাধীন চিন্তার পরাকাষ্ঠা দেখান নাই।

ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র

ইতিহাস ও উপন্যাস জ্ঞান, ভাব ও চিন্তার দুইটি বিভিন্ন দিক হইতে উৎপত্তিলাভ করিয়া প্রসারিত হইয়াছে। ইতিহাসের মূল প্রেরণা হইল অতীতের ঘটনা পরম্পরা ও সভ্যতার বিবরণ দান করা। ইতিহাস আমাদের হাতের কাছে যে সমস্ত উপাদান জোগাইয়া দেয় তাহাকে ভিত্তি করিয়া কল্পনার মায়াপুরী নির্ম্মাণই ঐতিহাসিক উপন্যাসের উদ্দেশ্য। ঐতিহাসিক উপন্যাস আমাদের মনের সম্মুখে অতীতকে জীবন্ত ভাবে ফোটাইয়া তোলে। সাধারণ সম্পৎরূপে যে ঐতিহাসিক তথ্য আমাদের হাতের কাছে রহিয়াছে তাহার ভিতর দিয়া মানব সমাজের অতীত যুগের ভাষা, ভঙ্গি, চিন্তা কিরূপ ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। অতীতের অসাধারণ জ্ঞান থাকিলেই ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। সমস্ত পরিবর্ত্তনের মধ্যে চিরন্তন মানব প্রকৃতির লীলা বিলাস যুগ যুগ ধরিয়া চলিয়াছে ও চলিবে। স্বপ্নবৎ অতীতের সহিত প্রত্যক্ষ বর্ত্তমানকে মিশাইয়াই অনুপম ঐতিহাসিক উপন্যাসের সৃষ্টি। ঐতিহাসিক উপন্যাস শুধু অতীত ঘটনাকে চিত্রিত করিতে চাহে না, অতীত জীবনকে মূর্ত্ত করিয়া তোলাই তাহার উদ্দেশ্য। ইতিহাসের ভিতর দিয়া আমরা অতীতকে জানি, ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভিতর আমরা অতীতকে দেখি। ইংরাজী সাহিত্যে Scott এই দিক দিয়া অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। এই পথে সার্থকতা লাভ করিবার জন্য তিনি পাঠকের দৃষ্টি ঐতিহাসিক চরিত্রের দিকে বেশী আকৃষ্ট না করিয়া কল্পিত চরিত্রের জন্য তিনি একটি ঐতিহাসিক পটভূমি মাত্র প্রস্তুত করিয়াছেন এবং একটি তদনুরূপ আবেষ্টনের সৃষ্টি করিয়াছেন।

এই দিক দিয়া বিচার করিলে 'চন্দ্রশেখরে' বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্ব কতখানি তাহা বিশেষ অনুধাবনের যোগ্য। পটভূমিটি যথাযথ হইয়াছে কিনা, ঐতিহাসিক চরিত্রকে অপেক্ষাকৃত প্রধান অংশ দিয়া তিনি ঐতিহাসিক স্বরূপ ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন কিনা ইহাই অনুধাবন পূর্ব্বক দেখিতে হইবে। আধুনিক গবেষণার ফলে 'চন্দ্রশেখরে'র ঐতিহাসিক ভিত্তি নড়িয়া উঠিয়াছে, তথাপি তৎকালীন সমাজচিত্র হিসাবে ইহার মধ্যে খুব বড় রকমের খুঁৎ ত দূরের কথা, সাধারণ ত্রুটি বিচ্যুতিও কেহ দেখান নাই। তাই ঐতিহাসিক উপন্যাসের একটা বড় লক্ষণ চন্দ্রশেখরে ফুটিয়া উঠিয়াছে এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে · স্কট্ ঐতিহাসিক উপন্যাসে যে আদর্শ অনুসরণ করিয়াছেন বঙ্কিমচন্দ্র তাহার ভিতর একটা সমস্যা-সমাধান-মূলক আদর্শ চন্দ্রশেখর ইত্যাদি কয়েকখানি উপন্যাসে যোগ করিয়া দিয়াছেন মাত্র।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের একটি প্রধান লক্ষণ 'চন্দ্রশেখরে'র মধ্যে পরিস্ফুট হইলেও ইহাকে রাজসিংহের ন্যায় খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা চলে না। কারণ ঐতিহাসিক চরিত্রের অবতারণা 'চন্দ্রশেখরে'র মূল উদ্দেশ্য নহে। ইহার মূল উদ্দেশ্য একটি বিশেষ সত্য প্রতিপাদন করা। যিনি প্রকৃত ইতিহাসজ্ঞ তাঁহার পথে এই গ্রন্থখানিকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলিয়া গ্রহণ করিবার প্রধান বাধা এই যে, ইহার মধ্যে মুখ্যতঃ ইতিহাস প্রসিদ্ধ কোন ব্যক্তির চরিত্র যথাযথভাবে অঙ্কিত হয় নাই। সেই জন্যই ইহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যাইতে পারে না।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে 'স্বপ্ন'

'কপালকুণ্ডলা', 'আনন্দমঠ', 'বিষবৃক্ষ', 'চন্দ্রশেখর' ইত্যাদি উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র স্বপ্নের অবতারণা করিয়াছেন। এই স্বপ্নগুলি নিরর্থক ভাবে প্রযুক্ত হয় নাই। প্রত্যেক স্থলেই ইহার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। কোন স্থলে ইহার মধ্য দিয়া তিনি ভবিষ্যৎ ঘটনার ছায়াপাত করিয়াছেন, কোথাও বা কোন চরিত্রের অবদমিত বাসনার ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন। অবদমিত বাসনাই যে স্বপ্নের প্রধান কারণ ইঁহা আধুনিক মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষকগণের অভিমত।

'চন্দ্রশেখরে' দ্বিতীয় খণ্ডের ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদের প্রথমেই একটি স্বপ্নের উল্লেখ আছে। এই স্বপ্নটির বিশ্লেষণ করিলে ইহার মধ্যে শৈবলিনীর অবদমিত আকাঙ্ক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়। সে যে আশায় গৃহত্যাগ করিয়াছিল তাহার পরিস্ফুট ইঙ্গিত ইহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে এবং ফষ্টরের প্রতি তাহার স্বাভাবিক ঘৃণাও সূচিত হইয়াছে।

শৈবলিনীর সুদীর্ঘ প্রায়শ্চিত্তের বিভীষিকাগুলিও মানসিক কারণে উদ্ভূত। এগুলিও এক শ্রেণীর স্বপ্ন ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রকৃত ঘটনা ও স্বপ্নের সংমিশ্রণে এই প্রায়শ্চিত্তের বর্ণনাটি অতীব সুন্দর হইয়াছে।

সম্পূর্ণ